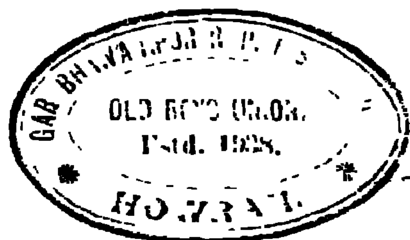
তমসা



শ্রীজ্যোতির্ময় রায়



দি বুক এম্পোরিয়ম লিঃ

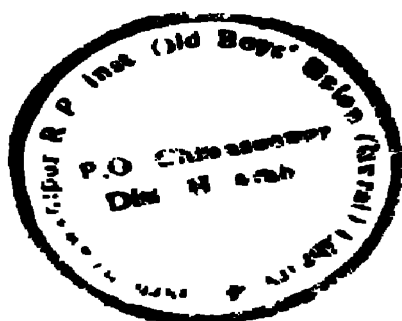
কাগজের জন্য অজস্র ধন্যবাদ
দি বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ-এর শ্রীযুক্ত প্রতাপকুমার সিংহকে

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র—১৩৫১

প্রচ্ছদ : ধরণী সেন

প্রকাশক—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
দি বুক এম্পোরিয়ম লিঃ
২২।১, কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি. এল. রায় স্ট্রীট
কলিকাতা



শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়

সুহৃদ্বরেষু—

তমসা

আমি

ভঙ্গুর

তামাসা

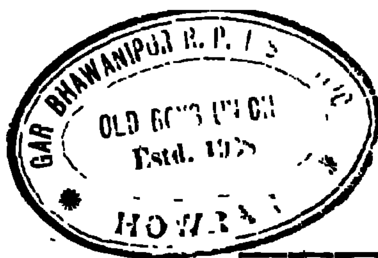
ঝাপসা চোখ

এক ফালি

হংস

লাল মাটি

স্পর্শক



তমসা

সমাজের যে অবস্থায় জন্মেছি তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলাম না—এ আমার অপরাধ না গুণ সে-কথা থাক। বাধানিষেধের ঝাঁপির ভেতর সাপুড়ের সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে আছি। দু'একবার ফোঁস ক'রে না উঠেছি এমনও নয়, কিন্তু তখনই টের পেয়েছি আমার ফণার চেয়ে থাবড়ার জোর বেশি। তার পর থেকে নারী জীবনের চলতি কর্তব্যই ক'রে চলেছি। প্রকৃতির দাবি মেনে একাধিক জীব গড়লাম কিন্তু মনের দাবি মেনে একটি জীবন গড়া হলো না।

মানুষ কোনো বোঝাকেই বোঝা ব'লে মনে করে না যতক্ষণ সামনে থাকে আশার হাতছানি। দুর্বহ তার কাছে একমাত্র ভবিষ্যৎহীন ব্যর্থতার ভার। সে-ভারই আমাকে বইতে হচ্ছে। মানলাম না, মানিয়ে নিতেও পারলাম না—এ এক বিষম বিড়ম্বনা। অবশ্য তা নিয়ে কাঁদুনি গাইতে বা নালিশ জানাতে বসিনি। মাঝে মাঝে এমন মুহূর্ত আসে যখন ইচ্ছে হয় যত দূর দৃষ্টি চলে গত জীবনটাকে একবার খতিয়ে দেখি। বিশৃঙ্খল সেই দেখাকে গুছিয়ে রাখতেই কলম নিয়ে বসা।

নারীজীবনের চারচারটে বড় অধ্যায়ই এ বুকের ওপর দিয়ে পার হ'য়ে গেছে। পুতুল বুকে নিয়ে জীবনের সুরু, বই বুকে

চেপে কাটলো কৈশোর, যৌবনে স্বামী, তারপর সন্তান। অতখানি নিবিড় ভাবে নতুন ক'রে বুকে টেনে নেবার মতো আর কিছুই নেই। এর পর আর যা আসবে তা হয় আস্বাদিত নয় তো কোথাও কোনো ফাঁক তাতে থাকবে। এ চার পর্ব পার হ'তে গিয়ে অনেক কিছুই ঘটলো। যার দৌলতে স্মৃতির কোঠা আজ বিচিত্র ঘটনার যাদুঘর।

তিরিশটা বছর পার হলো। আজও যখনই পেছন ফিরে তাকাই প্রথমেই মনে পড়ে পনের বছর আগেকার কথা। সবে তখন পনেরয় পা দিয়েছি। বাড়ন্ত গড়ন ছিলো আমার দেহের—তার চেয়েও দ্রুত ছিলো মনের গতি। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বুঝতাম ও ভাবতাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সবে উঠেছি, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলাম। পরিচ্ছদে এ পরিবর্তনের মূলেও অঙ্গ সম্পর্কে আমার অতিরিক্ত সচেতনতা। সুগঠিত পা হাঁটুর ওপর অবধি অনাবৃত। কৈশোরের সেই নির্ভাষ চামড়ায় যৌবনের আমেজ লেগে আমন্ত্রণের আভাস জেগে উঠেছে এটা আমার নিজের চোখেই ধরা পড়েছিলো—যুবকদের চোখে পেলাম তার সমর্থন। ফ্রক প'রে আর স্বস্তি বোধ করতাম না।

দেহ সম্পর্কে শুধু সচেতনই ছিলাম না, তার যত্নও নিতাম খুব। একটা ঘটনা এখনও মনে পড়ে। স্কুলে যাচ্ছি, পেছন থেকে কানে এল একটি ছেলের মন্তব্য। তার ভাষার উল্লেখ করবো না—কথাটা এই, আমি সুন্দর কিন্তু কটিদেশ থেকে আমার শ্রোণিযুগলের উত্থানটা একটু নাকি আকস্মিক, আরো

ক্রমিক হলেই হতাম একেবারে নিখুঁত। ঐ বয়সেও এ উড়ো মন্তব্যকে অবহেলা করতে পারি নি। বাড়ি ফিরে নিরীক্ষান্তে সমালোচককে প্রশংসাই করেছিলাম। এমনকি ভেবেচিন্তে একটা পথও বার করেছিলাম এ ক্রটি যাতে সারানো যায়।

অঙ্গ ও অন্তরের আলোড়ন আমাকে কিন্তু উচ্ছল করলো না, ক'রে দিলো স্তব্ধ। মুখে চোখে এবং সমস্ত দেহে কেমন একটা থমথমে ভাব। যেন মহা একটা শক্তিকে ভেতরে বন্দী ক'রে রেখেছি। মনে হতো আমার দৃষ্টি-ভঙ্গী-চাল-চলন সবারই বিশেষ একটা মূল্য আছে। দিদি আমার দু'বছরের বড়, সে ছিল ঠিক উল্টো স্বভাবের। চপল চলন, তরল তার কথাবার্তা। বাবা কলেজের একজন নামকরা অধ্যাপক, অতএব বাড়িতে ছাত্রদের আনাগোনাটা ছিল নিত্যনিয়মিত। দিদি মেতে থাকতো ওঁদের নিয়ে। ওর উৎসাহ পেয়ে বিজ্ঞানের ছাত্ররাও অনেকে দর্শনশাস্ত্রে উৎসাহী হ'য়ে উঠলো। ঘন ঘন আসতো বাবার মুখে দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনতে। সবার দিকেই দিদি এমন চোখে চাইতো যে দর্শনে আগ্রহ না এসে যায় না। রূপে আমার চেয়ে খাটো হয়েও ছাত্রমহলে ওরই নামডাক ছিলো বেশি। ছাত্ররা চ'লে গেলে তাদের নিয়ে নানা রকম হাসিঠাট্টা করা ছিল দিদির আর এক কাজ। যারা একটু বেশি ঝুঁকে পড়েছে মনে করতো তাদের সব নামকরণ হতো, গবেট লম্বা চালিয়াৎ—এই রকম। ওদের হাসি-কথা-তাকানোর বাঁকাচোরা নকল ক'রে বন্ধুদের নিয়ে আসর জমিয়ে

হাসাহাসি হতো—সেকি উচ্চহাসি! মেয়েদের গলাছাড়া হাসি এখন তো রীতিমত কুৎসিত মনে হয়, তখনও আমার ভালো লাগতো না। একদিন দিদি বন্ধুদের বলছিলো, 'জানিস ভাই, দু'দিন গবেটটার দিকে তাকিয়েছি আর ও ভেবে নিয়েছে আমি ওর প্রেমে প'ড়ে গেছি—ঢুলুঢুলু চোখে ক্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকে।' এক কোণে ব'সে শুনছিলাম—ভারি রাগ হলো, বললাম, 'গবেটও হয়তো বাড়ি থেকে ভেবে বেরোয়—যাই, স্যার-এর মেয়ের সঙ্গে একটু ইয়ার্কি দিয়ে আসি গে—' দিদি ততক্ষণে গবেটের তাকানো নকল করছে। পরিহাস কিন্তু জমলো না। দিদি ধমকে উঠলো, 'তুই গেলি এখান থেকে গোমরামুখী!' বেরিয়ে এসে মনে হলো দিদি যেন দামি-দামি সব শাড়ি-কাপড় আর গয়না মেঝেয় ছড়িয়ে পায়ের তলায় চট্‌কাচ্ছে আর খিলখিলিয়ে হাসছে।—একে মেয়ে তাতে ঐ বয়স, বোধহয় তাই সহজ টানে শাড়ি-গয়নার কথাটাই উপমা হিসেবে মনে এসেছিলো।

এখানেই ব'লে রাখি, গোমরামুখী কথাটা শুধু দিদির গাল নয়, ওটা আমার নামও। স্কুলের মেয়েদের মধ্যে আড়ালে ও-নামই আমার চলতি ছিল। আমার গাম্ভীর্যের বিকৃত ব্যাখ্যা ওটা। এক বছর আগেকার একটি ঘটনা থেকেই এ নামের শুরু। টিফিনের সময় ক্লাসে নিজের জায়গাটিতে ব'সে একটা গল্পের বই পড়ছিলাম, পাশেই দল পাকিয়ে মেয়েরা নবাগত ছাত্রীটিকে নিয়ে হল্লা করছে। অল্প সময়ের

মধ্যেই মেয়েটি সকলের খুব প্রিয় হ'য়ে উঠেছে। শুনেছি সে নাকি ভারি সব মজার মজার রসের কথা বলে—' অবশ্য সে-রস আমার সামনে পরিবেশন করতে কেউ কখনো আসেনি। পড়তে পড়তে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিলো। সেই মেয়েটি এসে দাঁড়ালো আমার সামনে—পেছনে দলের অন্য মেয়েরা। সবারই মুখেচোখে একটা চাপা হাসি আর মজা দেখার ভাব। মেয়েটি প্রশ্ন করলো, 'তোমার কি ভাই 'ডিউটি' ছিল কাল?' স্কুল-কুমারীদের এই ফার্স্টবুক ফাজলামোটাও আমার জানা ছিল না। অবাক চোখে তাকালাম মেয়েটির মুখের দিকে। মেয়েরা এ-ওকে জড়িয়ে হেসে গড়িয়ে পড়লো। প্রথমটা বুঝলাম না এত হাসির কি আছে এতে। আমার অজ্ঞতায় উৎসাহিত হলো প্রশ্নকারিণী। ডিউটিটা দিবাভাগে নয় সেটা জানিয়ে এমন কুৎসিত এক ইঙ্গিত করলো শুনে মুখ-চোখ আমার লাল হ'য়ে উঠলো। সজোরে এক চড় ক'ষে দিলাম তার গালে। নরম সাদা গালে তিনটে আঙুলের দাগ কি ভাবে ফুটে উঠেছিলো এখনো চোখে ভাসছে। এ নিয়ে কোনো নালিশ গেল না বড়দি'মণির কাছে, ওরা জানতো আমি সব কথাই ব'লে দেব। এর পর ও-জাতীয় অনেক স্কুল-কৌতুক আর আলোচনা ছুটোছাটা কানে এসেছে বটে কিন্তু আমাকে বিজ্ঞ বানাতে কেউ কখনো এগিয়ে আসে নি। গোমরামুখী নাম দিয়ে সবাই আমাকে দল থেকে বাতিল করেছিলো।

স্কুলেও একা, বাড়িতেও একা। ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারি না, মেয়েদের সঙ্গেও খাপ খায় না। বাড়ির সামনের গাছে ছিল একটা দোল্না, ব'সে ব'সে তাতে দোল খেতাম। পায়ের তলা থেকে কোমর অবধি শিরশির ক'রে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তো একটা সুখকর অনুভূতি—বেশ লাগতো। আর এক কাজ ছিলো টক খাওয়া। টক খেতে খুবই ভালবাসতাম—মেয়ে মাত্রেই যা ভালবাসে। মনে প্রশ্ন জাগতো, দোলনায় দুলতে, টক খেতে ছেলেরা কেন ভালবাসে না—এ শিহরণ কি তাদের দেহে জাগে না। এমন কত কথাই ব'সে ব'সে মনে হতো। সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করতো বাবার ছাত্ররা। কত সুদর্শন যুবক ছুতোনাতায় আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে—আমল দেই নি, কেমন যেন ভালো লাগতো না। একা একা ব'সে পরিষ্কার ক'রে ভাবতে চেষ্টা করতাম কি আমি চাই।

কি আমি চাই এ সমস্যার মীমাংসা একদিন হ'য়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সন্ধ্যার পর বসবার ঘরের একটা কৌচে ব'সে পা দোলাচ্ছি ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ঘরে এসে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক।

'ডক্টর চক্রবর্তী বাড়ি আছেন ?'

'হ্যাঁ আছেন—বসুন।' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম। লোকটির চোখের দিকে চোখ পড়লো, মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়ালাম।

পেছন থেকে বললেন, 'শোনো খুকী, কি নাম তোমার ?'

'খুকী' কথাটা আপত্তিকর শব্দের মতো কানে এসে লাগলো। আরো গম্ভীর মুখে বলতে গেলাম, 'শ্রীমতী—'

'শ্রীমতী-ট্রীমতী নয়, ডাক নাম কি বলো—ডাকনাম।'

'বাবলি।'

'বাঃ খাসা নাম, যেমনি ফুটফুটে চেহারা তেমনি সুন্দর নাম।' ছড়িটা একপাশে রেখে একটা কৌচের ওপর ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন। 'যাও বাবাকে বলো গে মিস্টার চৌধুরী—সুকান্ত চৌধুরী এসেছেন।'

ইনিই সুকান্ত চৌধুরী। আর একবার ভালো ক'রে দে'খে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাবার মুখে এঁর নাম আগেই শুনেছি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, দিনকয় হলো এ জেলায় বদলি হ'য়ে এসেছেন। খুবই নাকি বিদ্বান আর গুণী লোক—ভালো গাইতে পারেন। ক'দিনের পরিচয়েই বাবা এঁর গুণ, বিদ্যা ও ব্যবহারে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর কথা শুনেই বুঝেছি।

খবর পেয়ে বাবা ছুটে এলেন। হাঁকডাক ক'রে বাড়ির সবাইকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার পালা আসতেই সুকান্তবাবু বললেন, 'বাবলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সবার আগে।' বাবা বললেন, 'ইনি তোদের নতুন কাকাবাবু বুঝলি।' বাবা বুঝিয়ে দিলেন বটে কিন্তু এ-ডাক একবারের জন্যেও আমার মুখ দিয়ে বেরোয় নি।

আর সবাই বেরিয়ে গেল, আমি বাবার গা ঘেঁষে ব'সে রইলাম। কোনো পুরুষ সম্পর্কে এতখানি আগ্রহ ইতিপূর্বে

কখনো বোধ করি নি। সুকান্তবাবু আমার দিকে খুব যে একটা মনোযোগ দিচ্ছিলেন তা নয়, বাবার কি একটা প্রশ্নের উত্তরে নিজের ঝোঁকেই কথা ব'লে যাচ্ছিলেন। খুঁটিয়ে দেখবার পথে কোনো বাধাই ছিল না। লোকটিকে সুপুরুষ বলা চলে না। বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে। মাথার চুল সামনের দিকে হালকা হ'য়ে টাকের আভাস দেখা দিয়েছে, চওড়া কপাল তাতে আরও চওড়া দেখায়। তীক্ষ্ণ উঁচু নাক। সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে বুদ্ধিদীপ্ত চকচকে মিশকালো একজোড়া চোখ। বুদ্ধির দীপ্তিছাড়া সে-চোখে আরও কিছু ছিল যা প্রেমিক বা ভাবুকের পরিচয় নয়। সে যে কি তা তখন বুঝিনি, বুঝেছিলাম পরবর্তী জীবনে—পরিণত বয়সে আরবার যখন ও-জাতীয় চোখের দৃষ্টিপথে দাঁড়িয়েছিলাম।

বিদায় নেবার জন্য সুকান্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আমার চোখেব ওপর তাঁর চোখ পড়লো। মুহূর্তে তাঁর মুখের ভাবে একটা পরিবর্তন দেখা দিল—একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'কাল আবার এসো সুকান্ত—' খুব ভালো লাগলে আপনি বলতে পারেন না বাবা। 'বৌমা আর ছেলেমেয়ে দুটিকেও সঙ্গে এনো কিন্তু।'

'আনবো।'

সংক্ষেপে জবাব দিয়ে সুকান্তবাবু চ'লে গেলেন।

হঠাৎ অনুভব করলাম কেমন একটা ভালো লাগার আবেশে

মনটা আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে, সেই সঙ্গে মিশে আছে বিশেষ একটা ব্যক্তিত্ব বোধের অনুভূতি। উপস্থিত বা ভবিষ্যতের কোনো ভাবনাই তাতে ছিল না, বড়ো হয়ে জেগে ছিল শুধু একটা কথা—কাল আবার দেখা হবে।

দেখা হলো। শুধু পরের দিন নয়, প্রতি সন্ধ্যায়ই দেখা পেতে লাগলাম। বাবার সান্ধ্য আসরে যে-কোনো আলোচনায়ই তিনি হ'য়ে উঠলেন প্রধান বক্তা। গল্পও বলতেন চমৎকার। চাকুরিজীবনের অভিজ্ঞতায় রং ফলিয়ে টুকরো-টাকরা মজার সব ঘটনা বলতেন। বাবার মতো রাসভারী লোককেও কথার মাঝখানে হাত তুলে অবকাশ নিতে হতো উদ্গত হাসিকে আয়ত্তে আনতে।

বাবার পাশে আমিও একটি জায়গা ক'রে নিয়েছিলাম, ব'সে ব'সে তাঁর মাথায় হাত বুলোতাম আর ওঁর কথা শুনতাম। একদিন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা চলছে, কথার মাঝে সুকান্ত-বাবু ব'লে উঠলেন, 'বাবলি শুধু গল্পই শোনে না, আমাদের সব আলোচনাই বেশ মন দিয়ে শোনে দেখছি।'

'হ্যাঁ, তোমার কথা শুনতে ও ভারি ভালবাসে।' বাবা বললেন। 'রাতের পড়াশুনো তো ছেড়েই দিয়েছে—আমিও তেমন চাপ দিই না, এ সব আলোচনা না বুঝেও যেটুকু বুঝবে তাতে পাঠ্য বই গেলার চাইতে কাজ বেশিই হবে।' ব'লে মৃদু হাসলেন।

আমার উপস্থিতি একেবারে অবহেলার বস্তু নয় তাও

একদিন জানতে পেলাম। একটু দেরি হয়েছিলো আসরে যোগ দিতে, ঘরে ঢুকতেই সুকান্তবাবু বললেন, 'এতক্ষণে এলো আমার প্রধান শ্রোতা—বাবলি না থাকলে দর্শনের আলোচনাও যেন দানা বাঁধে না।' ব'লেই তাকালেন আমার দিকে। কথাটা যত সহজভাবে বললেন দৃষ্টিটা তত সহজ মনে হলো না।

কিছুদিনের মধ্যেই উনি আমাদের পরিবারের একজন মুরুব্বি হ'য়ে উঠলেন। বাবাও আত্মসমর্পণ করলেন ওঁর ব্যক্তিত্বের কাছে—সুকান্তের মত না নিয়ে এক পা চলেন না। বাড়ির সকলের সঙ্গেই তাঁর স্নেহ আর শ্রদ্ধার সম্পর্ক। মাকে সাংসারিক উপদেশ দিতেন, দিদিকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন, কেমন একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলতেন কেবল আমার বেলায়। আমার সঙ্গে যে-কটা কথা বলতেন তা এমনভাবে 'তুই' কি 'তুমি' বলেন তাও বোঝবার সুযোগ দিতেন না। অবশ্য তাঁর ব্যবহারে এই বৈষম্য আর কারুর চোখে ধরা পড়তো না, সূক্ষ্ম বুদ্ধির জোরেই সকলের লক্ষ্য তিনি এড়িয়ে যেতেন।

কোথা দিয়ে কি ক'রে যেন আমার মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিলো, ওঁর ওপর আমার বিশেষ একটা দাবি আছে। কোনো-কোনো দিন সকালে আসতেন—'কোর্টের সময় হলো' ব'লে যখনই উঠে পড়তেন, খুবই ছেলেমানুষী উপায়ে দাবির মাত্রাটা ক'ষে নিতাম মনে মনে। ভাবতাম, আমি যদি ওঁকে আজ কোর্টে যেতে বারণ করি তো কিছুতেই উনি যাবেন না।

অপরীক্ষিত এই সত্যে এতখানি আস্থা ছিল যে কথাটা ভেবেই মন গর্বে আনন্দে উৎফুল্ল হতো।

এক সন্ধ্যায় তিনি এলেন না। পরের দিন বাবা খবর নিয়ে জানলেন শরীরটা নাকি তেমন ভালো নেই। স্কুল ফেরতা হঠাৎ ঝোঁকে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম ওঁর বাড়ির সামনে—ঝিকে ব'লে দিলাম বাড়িতে বলতে। গাড়ি চ'লে যেতেই মনে হলো না নামলেই ছিল ভালো। এ সময় এ-ভাবে কেন এলাম তার একটা সঙ্গত অজুহাত কিছুতেই মনে দাঁড় করাতে পারলাম না। লজ্জায় সঙ্কোচে পা দুটো যেন ভারি হ'য়ে এলো। দ্বিধা নিয়েই ধীরে-ধীরে ভেতরে ঢুকলাম। বারান্দা পার হ'য়ে শোবার ঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম আরাম কেদারায় শুয়ে তিনি কি একটা বই পড়ছেন। আশেপাশে আর কারুর সাড়াশব্দ নেই। হিলের খুটখুট শব্দে চোখ তুলে তাকালেন। আমি বই বুকে চেপে দাঁড়িয়ে পড়লাম—বই-এর তলায় ধক্-ধক্ করছিলো বুকটা।

উনি আরামকেদারা ছেড়ে একেবারে উঠে পড়লেন, 'আরে—বাবলি যে—' ওভাবে দাঁড়িয়ে ওঠার মতো অভ্যাগত আমি নই সে-বিষয়ে সচেতন হলেন যেন। আস্তে এগিয়ে এসে একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু উনি তো বাড়ি নেই, এই মাত্র পাশের কোন বাড়ি যেন গেলেন—'

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথাই সরলো না। অস্পষ্ট এই সংকোচের জড়িমা ঝেড়ে ফেলার জন্যেই হঠাৎ তিনি ব'লে উঠলেন, 'তারপর বাবলি, হঠাৎ তুই ইস্কুল থেকে এখানে?'

এই প্রথম তিনি স্পষ্ট তুই ব'লে সম্বোধন করলেন। দিদিকে যে-ভাবে আদর করেন তেমনি হাত ধ'রে কাছে টেনে নিলেন। আমার সর্বশরীর কাঁপছিলো। বইগুলো হাত থেকে খ'সে মাটিতে প'ড়ে গেল, দেহটা এলিয়ে পড়লো তাঁর বুকের ওপর। অনিচ্ছাকৃত এ পারম্পর্যের জন্তে দু'জনের কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। অর্ধ চেতনের মতো চোখ তুলে চাইলাম তাঁর মুখের দিকে, সে-মুখও বিবর্ণ—তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। ধীরে-ধীরে আমাকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। বইগুলো কুড়িয়ে গুছিয়ে রাখলেন টিপাই-এর ওপর, তারপর একটা জামা গায়ে চড়িয়ে বললেন, 'চলো বাবলি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

মনে আছে সে রাতে শুয়ে-শুয়ে খুবই কেঁদেছিলাম। দুঃখ আর হতাশায় মনটা সেদিনই প্রথম মুষড়ে পড়লো। কেন হলো, কি হলো কিছুই যেন ভালো ক'রে ভাবতে পারলাম না। শরীর খারাপের জের টেনে তিনিও আমাদের বাড়ি আসা কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করলেন। যেদিন এলেন দেখে মনে হলো গোটা মানুষটাই বদলে গেছে—দেহে মনে সেই সজীবতার লেশমাত্র নেই।

এদিকে আমাদের বাড়ির ঘটনাপ্রবাহের গতি হঠাৎ যেন দ্রুত হলো।

দিদির বিয়ে স্থির হ'য়ে গেল। শুকান্তবাবু নিয়মিত আসা বন্ধ করেছিলেন, বাবা আবার রোজ তাঁকে ধ'রে আনতে

লাগলেন। প্রতি কাজে তাঁর পরামর্শ চাই। তিনিও যথারীতি কর্তব্য সেরে চ'লে যেতেন।

বাবা কিসের ফর্দ তৈরী করছেন, আমি কাছেই ব'সে ছিলাম। সুকান্তবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। বাবা সাগ্রহে তাঁকে ডেকে বসালেন। আমি উঠবো ভাবছি এমন সময় বাবা বললেন, 'বাবলি তুই একটু যা তো মা, আমাদের একটু কথা আছে।'

কেমন একটা কৌতূহল হলো। বেরিয়ে পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যে-কথা কানে এলো তাতে জ'মে যেন পাথর হ'য়ে গেলাম। ভালো একটি পাত্র পাওয়া যাচ্ছে, এক সঙ্গেই কাজ সেরে ফেলবেন কিনা সে-বিষয়ে ওঁর পরামর্শ চাচ্ছেন। বিয়ে যখন দিতেই হবে তখন পাত্র হাত ছাড়া করা সমীচীন নয় এ সম্পর্কে যথাসম্ভব যুক্তি দেখিয়ে সুরু করলেন বরের পরিচয়। ছেলেটি তাঁরই ছাত্র। এম. এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়ে রিসার্চে নিযুক্ত আছে। অদ্বৈত ব্রাহ্মণ। বাপ গুরু পুরোহিত, বহু ঘর শিষ্য আছে। আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। এসব কোনো কিছুকেই বাবা বাধা ব লে গণ্য করেন না, তিনি নিজেও ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। নিজের জীবন নিজের হাতে গড়বে এমন ছেলেই তিনি চান। সরকারী পরীক্ষায় মাথা দিলে চাকরির ক্ষেত্রে এ ছেলে অনেক উঁচুতে স্থান ক'রে নেবে সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

শ্রোতার মুখের ভাব দেখতে পেলাম না, তিনি ব'সে ছিলেন দরজার দিকে পেছন দিয়ে। অস্ফুট কণ্ঠের উত্তর শুনলাম, 'দেখুন, আপনি যা ভালো বোঝেন—তবে কিনা বয়েসটা বিয়ের পক্ষে খুবই কি অল্প নয়? তা ছাড়া অমন গোঁড়া পরিবার, মানিয়ে নিতে পারবে কি?'

আগ্রহের আতিশয্যে বাবা নিজের মতের সমর্থনে অনেক যুক্তিরই অবতারণা করলেন। তাঁর আগ্রহ দেখে কি অন্য কারণে জানিনে সুকান্তবাবু কিন্তু একেবারেই চুপ ক'রে গেলেন।

আমার কান্নাকাটি ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রেই কনে দেখা থেকে শুরু ক'রে বিয়ের দিন অবধি ধার্য হ'য়ে গেল। সুকান্তবাবুর স্ত্রী এসেছেন আমাদের বাড়ী, সে-সুযোগে বন্ধুর বাড়ির নাম ক'রে বেরিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম, 'এ বিয়ে আপনাকে বন্ধ করতে হবে।' কোলে মুখ লুকিয়ে প'ড়ে রইলাম, তিনিও আমার মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'এ বিয়ে আমি বন্ধ করতে পারতাম—এখনও হয়তো পারি—কিন্তু তা করবো না—আমার আদেশ হিসেবেই এটা তুমি মেনে নাও বাবলি, এতে তোমার ভালো হবে—' আমি দুরন্তভাবে মাথা নেড়ে উঠলাম। হালকা হাতে পিঠে চাপড় দিতে দিতে বললেন, 'পাগলী—আমরও অনেক কথা বলবার রইলো তোকে, বছর চার পরও শোনবার মতো আগ্রহ থাকে যদি তো বলবো—

আমার মতো বেপরোয়া চরিত্রকে কি ভাবে যে দাবিয়ে রেখেছি—' হঠাৎ থামলেন, '—না বাবলি, এ বিয়ে হ'য়ে যাক এ আমারও ইচ্ছে—'

চার বছর পরে কি তিনি বলবেন, আজকেই বা বলছেন না কেন—সেকি বুঝবো না ব'লে, না অন্য কারণ আছে জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পেলাম না।

বিয়ে আমার হলো। শুভদৃষ্টির সময় বরের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুকান্তবাবু, তাঁর সঙ্গেই হলো প্রথম দৃষ্টি বিনিময়। পরে সকলের পীড়াপীড়িতে আর একবার চোখ তুলে রীতি রক্ষা করেছিলাম মাত্র।

বর দেখে সকলেই খুশি। মা ব'লে বেড়াতে লাগলেন ফুটফুটে কার্তিকের মতো বর হয়েছে। আমার চোখে কিন্তু গৌরবর্ণ নিষ্প্রাণ একটি নিরীহ জীব ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি। তখনকার জন্যে তা নিয়ে আমার মনে কোনো নালিশ ছিল না। কারণ ঐ একটি লোক ছাড়া আর কাউকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করবো এ ছিলো ধারণার অতীত।

ফুলশয্যার রাতেই স্বামী টের পেলেন দুর্বহ এক বোঝাকে তাঁর সঙ্গে সাতপাকে জড়ানো হয়েছে। শুকনো চোখে রওনা হলাম শ্বশুর বাড়ি। দিদির কান্না তখনো সবার কানে লেগে আছে। আমার এই অস্বাভাবিক কাঠিন্যে সকলে যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। আত্মীয় বন্ধু সকলেই উপস্থিত ছিল, ছিল না শুধু একজন।

ছ'মাসের মধ্যে আমার ছুর্ভেন্ত নীরবতা দিয়েই স্বামী শুদ্ধ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ক্ষিপ্ত ক'রে তুললাম। অপরের সঙ্গে 'হুঁ' 'না' যেটুকু বা উচ্চারণ করেছি, স্বামীর প্রশ্নের বেলায় ছিলাম পাষাণের মতো স্তব্ধ। বেচারার জন্য দুঃখ বোধ না করেছি এমন নয় কিন্তু কেমন একটা জেদে পেয়ে বসেছিলো। স্বামীর চোখে মাঝে মাঝে ফুটে উঠতো অক্ষমের অসহায় হিংস্রতা, তাতে বিদ্রোহের ভাবটা আমার মধ্যে দেখা দিতো আরও তীব্র হ'য়ে।

অপরিসীম তিক্ততা নিয়ে ওঁরা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পিত্রালয়ে। ব'লে গেলেন বৌ পায়ে ধ'রে অনুরোধ না জানানো অবধি তাঁরা তাকে গ্রহণ করবেন না। অবিশ্যি চাওয়া মাত্র ধরবার মতো পদ প্রাপ্তির ভরসাটা সে ধমকের মধ্যে ছিল— থাকার কারণ যে আমার অপরিণত বয়স সেটা জানিয়ে দিতেও তাঁরা ক্রটি করেন নি।

পরিবারে ব্যাপ্তভাবে দেখা দিলো একটা অশান্তির ছায়া। ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও আমার মনে যে ক্ষীণ আলোটুকু জ্বলছিলো বাড়িতে পা দিয়ে তাও দপ ক'রে নিভে গেল। সুকান্তবাবু হঠাৎ বদলি হ'য়ে চ'লে গেছেন দিন কয়েক আগে— আকস্মিক এই বদলির পেছনে তাঁর নিজেরই হয়তো বা হাত ছিল। অন্তর ও আবেষ্টনের এই কালো ছায়াপাতে আমার জেদ কিন্তু দমলো না মোটেই। মায়ের চোখের জল, বাবার স্তব্ধ গাম্ভীর্য, আত্মীয়স্বজনের ক্লান্তিকর উপদেশ উপেক্ষা ক'রে আমি বাপের বাড়িতেই র'য়ে গেলাম।

কৈশোরের এই পটভূমিতে হলো যৌবনের আবির্ভাব। চারদিক থেকে হতাশা আর তিরস্কার করলো তার অভ্যর্থনা। দুঃখের চাপে দেহকে কিন্তু ভুললাম না। গোপনে তার যত্ন নিতাম। কোথায় এই দেহ আর রূপের সার্থকতা ভাবতে পারতাম না, তবু সুযোগ পেলেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতাম নিজের বস্ত্রবিমুক্ত দেহের দিকে—মনে হতো শিশিরসিক্ত ফুলরেণুর লাবণ্য নিয়ে জেগে উঠেছে প্রতিটি রোমকূপ।

একে একে দু'বছর কেটে গেল—গেল বর্ণবৈচিত্র্যহীন ভাবে। দিন রাত প'ড়ে প'ড়ে শুধু বই পড়তাম। বাবার লাইব্রেরির দিশি-বিলিতি সাহিত্য প্রায় শেষ ক'রে এনেছিলাম। ইংরিজি সাহিত্য বুঝতাম কম পড়তাম বেশি। ভাষাটাকে জয় করার একটা অদম্য প্রয়াস ছিল ভেতরে। দর্শনেও দাঁত বসাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তখন পেরে উঠিনি।

এই আঘাত পেয়েই হ'ক বা যে কারণেই হ'ক, শুনলাম, স্বামী নাকি সরকারী বড় চাকরির চেষ্টা ছেড়ে ঢুকে পড়েছেন কলকাতার একটা কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হ'য়ে। বাড়ির সকলের ধারণা ছিল শ্বশুরালয়ের ধর্মনিষ্ঠা আর গোঁড়ামির জন্যেই আমার এই বিতৃষ্ণা। হয়তো তা হ'তে পারতো, কিন্তু আমি যে অপর পক্ষের দোষগুণ খতিয়ে দেখার দরকারই বোধ করিনি সে-কথা কেমন ক'রে বোঝাবো। ভালো মানুষ হিসাবে আমার স্বামীর ছিল বিশেষ সুনাম। সকলেই বলতো এমন ভালো মানুষের সঙ্গে না বনবার কি কারণ থাকতে পারে তাঁরা

বোঝেন না। পরবর্তী জীবনেও এ-কথা বহুবার শুনলাম, কিন্তু এ আমি আজও বুঝলাম না, মেয়েদের মুখ দিয়ে কথাটা কি ক'রে বেরোয়—ভালো মানুষ হ'লেই ভালো স্বামী হবে! ভালত্ব স্বামীত্বের কতটুকু!

স্বামীর চাকরি হয়েছে এখন অনায়াসেই তিনি আমাকে নিয়ে কলকাতায় থাকতে পারেন—অতএব নতুন উদ্যমে সুরু হলো আবার আমার মধ্যে স্বামীর প্রয়োজনবোধ জাগিয়ে তোলার। সকলের মুখেই এক কথা, যা হবার হ'য়ে গেছে এখন এরই সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে—তা ছাড়া উপায় কি। কেন উপায় থাকবে না? একটা জীবনকে উপায়হীন করবার কি তোমাদের অধিকার আছে? যা মুহূর্তে জীবনকে ক'রে ফেলে উপায়হীন, এমন উপায়কে আঁকড়েই বা আছ কেন! কথাটা শোনা মাত্র আমার দেহ-মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতো। বই প'ড়ে প'ড়ে মনের নানা প্রকোষ্ঠে যেন বাতি জ্বলে উঠেছিলো, নিজের সমর্থনে যুক্তিরও অভাব হতো না।

এমন সময় এক চিঠি পেলাম সুকান্তবাবুর কাছ থেকে। এই প্রথম পত্র। বোধ হয় বাবার অনুরোধে প'ড়েই লিখেছেন। এইটুকু সকলেই জানতো তাঁর প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা। খুবই ছোট চিঠি। অনুরোধ বা আদেশ তাতে নেই। শেষ লাইনে লেখা একটি মাত্র উপদেশ—'সহ্য বা সাহস যে-কোনো একটিকে সম্বল ক'রে এগিয়ে চলো বাবলি, থেমে থেকো না।'

তাইতো। থেমে থাকবো কেন? সাধারণ নারীজীবনে যৌবন গেলে আর রইল কি? আগের আগা আর গোড়ার মতো আর দুটো অংশ তো মধ্যেরই ভূমিকা আর উপসংহার—একটা জলো, অন্যটা রূপহীন বিকৃত রসের আধার মাত্র। স্থির ক'রে ফেললাম সাহসকেই আমি সম্বল করবো। যেভাবেই হ'ক সার্থকতার পথ খুঁজে বার করতে হবে। কি সেই পথ, কেমন ক'রে খুঁজবো, ভেবে দেখার আগেই একদিন বাবা নিজে এলেন আমাকে বোঝাতে। অন্য বারের মতো প্রতিবাদ না তুলে কি ভেবে যেন মৌন হ'য়ে রইলাম। সম্মতির প্রথম আভাস পেয়ে বাবা চ'লে গেলেন কলকাতায়, ফিরে এলেন স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে।

সকলের স্বস্তির নিঃশ্বাস পিঠে নিয়ে এবার আমি সত্যি-সত্যি রওনা হলাম স্বামীর ঘর করতে। এখান থেকেই সুরু আমার জীবন ও যৌবনের অভিযান।...

বড়লোকের রূপসী মেয়েকে তুষ্ট করার ইচ্ছা যে স্বামীর মধ্যে আছে তা কলকাতার বাড়িতে পা দিয়েই টের পেলাম। আমাদের বাড়ির অনুকরণে ছোট্ট একটি বসার ঘর তিনি সাজিয়ে রেখেছেন। খুব অসুবিধা বোধ করলে অভ্যাস অনুযায়ী খাবার ব্যবস্থাটা আমি টেবিলেও করতে পারি, বাড়ি পৌঁছে এ অনুমতিটাও তিনি দিয়ে রাখলেন। অর্থাৎ পারি-বারিক গোঁড়ামিটা তাঁর মধ্যে তেমন তীব্র নয় বা সেটা আমার জন্য বর্জন করতে তিনি প্রস্তুত।

অন্তরে যাঁকে গ্রহণ করবার তা করেছি, দেহটা ওঁরই হাতে সঁপে দেব এটা স্থির ক'রেই এসেছিলাম। আস্তে আস্তে মনও যদি বদলায়, ভালো। স্বামীর আদর তাই বেশ সহজ হয়েই গ্রহণ করলাম। প্রথম রাত্রির একটা ঘটনা স্মরণ হ'লে আজও হাসি পায়, ভাগ্যের বিড়ম্বনা দেখে সেদিন কিন্তু দুঃখও হয়েছিলো। শারীরিক সান্নিধ্যে একটা দুর্বল মুহূর্তে মুখের কাছে মুখ নিয়েছি, স্বামী চম্‌কে মুখ সরিয়ে বললেন, 'না, মুখে না।' অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?' বললেন, 'মুখ এঁটো হবে যে।' সমস্ত স্নায়ুকে তিক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি যেন সব কিছুর জন্য তৈরি হ'য়ে ছিলাম—খিলখিল ক'রে হেসে উঠলাম। লজ্জা পেয়ে বললেন, 'না ঠিক তা নয়, আমার দাঁত খুবই খারাপ কিনা—'

বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে ওঁর সংস্কারের পরিচয় আমি পেতে লাগলাম। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ভাদ্রমাস এ সবে দাম্পত্য-জীবনের নিবিড়তম সংসর্গ তিনি এড়িয়ে চলতেন নানা অছিলায়। আমি বুঝেও না বোঝার ভান করতাম। খাওয়া সম্পর্কেও তাঁর বাছবিচার ছিল নিষ্ঠাবান হিন্দুর। কিন্তু আমার রুচিতে আপত্তি তুলতে আসতেন না। সব চেয়ে সচেতন ও সতর্ক ছিলেন নারীদেহের পবিত্রতায়। পরপুরুষের ছোঁয়া লাগলেই তা কলঙ্কিত হ'য়ে যায় এমনি ছিল তাঁর মনোভাব। পথ চলতে কারুর সঙ্গে আমার গা ঠেকে গেলেও তিনি যেন শিউরে উঠতেন। সতীত্বের প্রতি ওঁর এই শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসকেই একদিন আমি বেছে নিয়েছিলাম আমার মুক্তির সহায় ব'লে—সে কথা এখন থাক।

নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রীর কর্তব্য ক'রে চলেছি দে'খে আত্মীয়স্বজন, এমনকি স্বামীও যখন তুষ্ট, আমার মধ্যে তখন ধীরে ধীরে জমে উঠছে একটা বিষাক্ত বিদ্রোহ। স্বামীর হিঁদুয়ানিকে, সমগ্র পুরুষ জাতটাকে এলোপাথাড়ি আঘাত আর অপমান করতে সে উদ্যত। নিজের এই রূপ নিজের কাছে ধরা পড়বার আগেই তার ক্রিয়া সুরু হলো। ওঁর এক মামাতো ভাই আসতো আমাদের বাড়ি, প্রায় ওরই সমবয়সী। তাকে আমি কাছে টানলাম শুধু চোখের দৃষ্টি আর চালচলন দিয়ে। উনি কলেজে চ'লে যেতেন, আমরা দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখোমুখী ব'সে থাকতাম। একটা মাত্রায় পৌঁছে ও আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। একদিন আমার হাত চেপে ধ'রে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে বসলো। বর্ণ-চোরার মতো মুহূর্তে আমার মূর্তি বদলে গেল। রূঢ় ভাষায় তাকে তিরস্কার করলাম, অনাবিল স্নেহকে এমন কদর্থ অর্থে গ্রহণ করেছে ব'লে। লোকটি সিক্ত চোখে পায়ে হাত দিয়ে মার্জনা চেয়ে বিদায় নিলো। একটা পাশবিক উল্লাসে মনটা আমার নেচে উঠলো।

এর পর থেকেই সুরু হলো এই খেলা। আত্মীয়-বন্ধু-যুবক-প্রৌঢ় নির্বিচারে কাছে টানতাম আর আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিতাম। দিদির সেই খেলার রাজ সংস্করণ। যার ছিঁচ্‌কে রূপ দেখেই একদিন ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। যাকে আকর্ষণ করতাম, সে যখন আমার গ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিত হ'য়ে নিবেদন করতে উদ্যত, তখন তাকে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে আমন্ত্রণ করতাম চা-এ

—স্বামীর অনুপস্থিতি বুঝে সময় নির্বাচনটা হতো ইঙ্গিতের একটা অঙ্গ। এ চা কেউ তারা গলাধঃকরণ করতে পারে নি। কেউ বলেছে দেবী, কেউ ক্ষোভে অপমানে মুখচোখ রক্তবর্ণ ক'রে উঠে পড়েছে, কেউ বা দুটো রূঢ় কথা ব'লে বেরিয়ে গেছে। সব অবস্থায়ই আমার উল্লাস ছিল সমান। এ অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি জেনেছিলাম, কোনো মেয়ের সচেষ্ট আকর্ষণ অবহেলা করতে পারে এমন পুরুষের সাক্ষাৎ কদাচিৎই মেলে—আমি অন্তত পাই নি। তবু জানি এ নিয়ে গুরুতর একটা কিছু ঘটে গেলে আইনগত শাস্তিটা পড়বে পুরুষেরই অংশে। পুরুষের সমাজ—তাই সমগ্র দায়িত্বটা সে রেখেছে নিজের ঘাড়েই। নারী যখন বস্তু ব'লে গণ্য হতো এ আইনের জন্ম তখন—যখন তাকে নিয়ে লড়াই চলতো এবং বস্তুরই মতো সে হতো বিজেতার করতলগত। আজ আমরা ব্যক্তি হয়েও সে আইনেরই বাঁধন সইছি। ভেবে হাসি পেতো।

সংসারের কাজে বড় একটা হাত ছোঁয়াতাম না। সবই ছাড়া ছিলো ঠাকুর চাকরের হাতে। কেবল ঐ খেলা নিয়েই কেটে গেল আরো তিনটে বছর। এক-এক সময় গ্লানিতে মনটা ভ'রে উঠতো। নিজেকে মনে হতো বড়ো একা। সন্তানের আবির্ভাব ঠেকিয়ে রেখেছিলাম সযত্ন প্রয়াসে—পাছে দেহের বাঁধন শ্লথ হ'য়ে পড়ে। এ বিষয়ে স্বামীকে বাধ্য করতে কম বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু ঘুরে ফিরে মনে হ'তে লাগলো, কি হবে এই দেহ আর রূপ নিয়ে, কিসের জন্যে এ পসরা সাজিয়ে আমি দিন গুনছি—কি আমি চাই।

আমার এ প্রশ্নের জবাব দিতে ভাগ্য এবারও যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল।

কিছুদিন হলো স্বামীর কাছে দর্শনশাস্ত্রের পাঠ নিচ্ছিলাম, তারই একটা বই-এর পাতা ওল্‌টাচ্ছি, চাকর এসে একখানি চিঠি হাতে দিলো। জানালো, যে বাবুটি চিঠি নিয়ে এসেছেন তিনি বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন। ঠিকানার হস্তাক্ষর দেখেই চিনেছিলাম সুকান্তবাবুর চিঠি। তাড়াতাড়ি খুলে পড়লাম। সংক্ষিপ্ত খবর। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে কলকাতায় এসেছেন। অবসর মতো একবার যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি—তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই, সে-কথাও লিখেছেন।

বহুদিনের সঞ্চিত অভিমান গুমরে উঠলো। জীবনের দিনগুলো যাঁর জন্যে একটানা অবসর দিয়ে ভরিয়ে রেখেছি তিনি লিখছেন তাঁরই জন্যে অবসর খুঁজতে। অভিমান ঝেড়ে উঠে বসলাম। কি অসুখ, কতদিন থাকবেন কলকাতায়—ছুটলাম বাইরের ঘরে পত্রবাহকের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢুকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম। যে যুবকটি উঠে দাঁড়ালো, ব'লে দিতে হয় না সে সুকান্তবাবুর ভাই। সব চেয়ে বেশি মিল চোখের চাউনিতে—সেই চোখ!

এবার মুহূর্তে এ দৃষ্টির বিশেষত্ব আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দিলো। এতে কবিত্ব নেই, নেই প্রেমালুতা। শুধু সূক্ষ্ম একটা রেখা যেন টেনে দেয় নারী আর পুরুষের মাঝখানে। অশরীরী একটা বৈশিষ্ট্যের আভাস জেগে থাকে আর জাগিয়ে

দেয়—তুমি নারী, আমি পুরুষ। তাতে দম্ভ বা কৃপা নেই, নেই আবেদনের দৈন্য।

একে সুকান্তবাবুর ভাই তাতে আবার তাঁরই মুখের প্রতিচ্ছবি ওঁর মুখ। লোকটিকে আপনার ভেবে নিতে সময় লাগলো না। নাম সুজিত। বয়স সাতাশ কি আটাশ হবে। দৈর্ঘ্যে সুকান্তবাবুর চেয়ে সামান্য বেশি। গলা খুলে কথা বলে, উঁচু গলায় হাসে। কথা বলার সময় চোখের দিকে খুব কমই তাকায়। ওঁর দাদার সঙ্গে আমার আত্মিক পরিচয়ের কথাটা স্মরণ ক'রে পর্যায়ে একটা গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। নবাগত ভদ্রলোকের প্রাপ্য সম্মানের চেয়ে স্নেহের ভাবটাই রইলো বড়ো। প্রশ্নের পর প্রশ্নে বেচারাকে বিব্রত ক'রে তুললাম। শুনলাম, সুকান্তবাবু কঠিন হাঁপানি রোগে ভুগছেন। খুবই কাতর অবস্থা। দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়েছেন—কাজে যোগ দেবার ইচ্ছা উৎসাহ কোনোটাই নেই। সুজিত বারবারই বললো, দাদা কেমন নাকি হ'য়ে গেছেন। কোনো বিষয়েই আর তাঁর আগ্রহ নেই, এমন কি স্বাস্থ্য ফিরে পাবার দিকেও না।

ব্যথায় মনটা টনটন করতে থাকে। ইচ্ছে হয় সব ভেঙে-চুরে ছুটে যাই ওঁর কাছে। তবু অপেক্ষা করতে হয় স্বামীর অনুমতির। সুজিতকে বসিয়ে রাখলাম। অবিশ্যি জানতাম ওঁর অমত হবে না। সুকান্তবাবু প্রবীণ মানী লোক, তা ছাড়া তিনি যে বাবার বিশেষ বন্ধু এবং আমাদের পরিবারের একজন মুরুব্বিবিশেষ তা উনি ভালোই জানতেন।

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে বেরোতে দিতে স্বামীর মন বুঝি সরলো না, তিনিও সঙ্গে গেলেন পৌঁছে দিতে। কাজের তাড়া ছিলো, সুকান্তবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করেই তিনি বিদায় নিলেন। আমি ঘরে ঢুকে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম—এই সেই দেহের ভগ্নাবশেষ! বুকে মালিশ দেওয়া হচ্ছিলো, মনে হলো বুক নয় তো ছোট একটি কারখানা ঘর। যেখানে যে কলটি নড়ছে বাইরে থেকে ব'লে দেওয়া যায়। মাথায় টাক প'ড়ে গেছে। যে ক'গাছি চুল আছে তারও বেশির ভাগই পাকা।

মালিশ বন্ধ ক'রে স্ত্রীকে কি একটা কাজে বাইরে পাঠালেন। বুকের ওপর চাদরটা টেনে নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে ব'সে বললেন, 'কি বাবলি, একেবারে চুপ ক'রে গেলে যে—'

তবু কোনো কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোলো না।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'সহজ মনে সব মেনে নিতে পেরেছ?'

মাথা নেড়ে জানালাম, 'না'।

বড় রকমের একটা শ্বাস টেনে নিয়ে খুব ধীরে-ধীরে সেটা ছাড়লেন। 'অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে হয়, ব'লে লাভ কি—' থেমে থেমে সুকান্তবাবু বলতে লাগলেন। 'বড়ো দেরিতে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বাবলি—তখন আর কোনো উপায় ছিল না—' সেই উপায়হীনতার কথা। দুঃখের মধ্যেও আমার মাথা জ্বালা ক'রে ওঠে। 'ভাবতে গিয়ে যখন দেখলাম আমি সবই করতে পারি কিন্তু অমলাকে মুক্তি দিতে পারি না—'অমলা

ওঁর স্ত্রীর নাম। 'সে অধিকার আমার হাতে নেই। তখন —তখন বাধ্য হ'য়েই—' কথা শেষ না ক'রেই থামলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে ম্লান হেসে বললেন, 'মনে ও দেহে এমন দুটো রোগই সংগ্রহ করলাম যা শেষ ক'রে ফেলবে না, ভোগাবে। কোনোটার হাত থেকেই রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই, কেবল চেপে রাখতে পারি মাত্র—' রুগ্ন চোখে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে।

চোখের জল আর গোপন রাখতে পারলাম না। কণ্ঠ চেপে আসছিলো উচ্ছ্বসিত কান্নায়, সামলে নিতে উঠে গেলাম বারান্দায়।

ও-বাড়ি থেকে যখন বেরোলাম রাত হ'য়ে গেছে। সুজিতই সঙ্গে এলো পৌঁছে দিতে। ট্রামের ভিড়ে গা ঢোকাতে আর ইচ্ছে হ'লো না। বললাম, 'বেশি তো দূর নয়, চলুন এ পথটুকু হেঁটেই যাওয়া যাক।'

মন ক্রমে শান্ত হ'য়ে এলো। দুঃখের ঘন বাষ্প কেটে যেতে স্পষ্ট অনুভব করলাম, সুকান্তবাবুর দিকে যে তীব্র টান আমার ছিল সেটা কোথায় যেন ঢিলে হ'য়ে গেছে। লোকটির জন্যে মনের মধ্যে জেগে আছে একটি করুণার সুর। কেন এমন হলো? মনপ্রাণ দিয়ে যাকে চেয়েছিলাম তার সুষ্ঠু রূপের স্বাদ আমি পাই নি, তাই বুঝিবা তার পরিত্যক্ত এই অবলম্বনটাকে আঁকড়ে থাকতে পারছি না। যে আমাকে টেনে ছিল সে আজ নেই—নেই সেই মন, সেই দেহ। মধুর কোনো

স্মৃতির শৃঙ্খলেও সে আমাকে জড়িয়ে যায় নি এ কঙ্কালের সঙ্গে। আমার মনের এত দিনকার একমাত্র অবলম্বন আজকের এই আঘাতে যেন ধ্বসে পড়েছে। অবসন্ন পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম সুজিতের সঙ্গে। সারাটা পথ একটিও কথা বলেছি ব'লে মনে পড়ে না।

বাড়ীর দরজায় পৌঁছে সুজিত বললো, 'আমি তাহ'লে আসি এখন—'

সঙ্গীর অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন ক'রে সচেতন হলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'একটু বসবেন না—' চোখ তুলে তাকাতেই সুজিতের মুখ চোখে পড়লো। মন যেন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। এইতো—এইতো সে দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে, যাকে তুমি পাঁচ বৎসর ধ'রে কামনা ক'রে আস্ছো। সেই চোখ, সেই বুদ্ধি ও প্রাণের দীপ্তি।

পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলাম সুজিতের মুখের দিকে। সুজিত কেমন একটু অবাক হয়েই নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলো। আমি কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হ'য়ে রইলাম সেইখানে।

সুকান্তবাবুর অসুখের সূত্র ধ'রে ওদের বাড়ি রোজই প্রায় যেতে লাগলাম। সুকান্তবাবুর শারীরিক অবস্থার খবরা-খবর নিয়ে চ'লে যেতাম সুজিতের ঘরে। সুজিত চিত্রকর। ঘরের এখানে-ওখানে সব ছবি দাঁড় করানো। অল্প সময়ে সে নামও করেছে। তার ছবিতে নাকি প্রতিভার পরিচয়

রয়েছে। গেলেই সুরু হতো ছবির আলোচনা। তার ব্যাখ্যার কিছু বুঝতাম, কিছু বা শুনতাম বক্তার কথা শোনবার জন্যেই। সুজিতের চোখের দিকে যখনই চোখ পড়তো, কেবলই মনে হতো, এ খেলার সামগ্রী নয়। যাদের নিয়ে খেলা চলে তাদের আমি অনেক দেখেছি। এ তো সে-জাতের নয়। এ যখন হাত পাতবে অঞ্জলি ভ'রে আদায় ক'রে নেবে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠতো, আবার না গিয়েও থাকতে পারতাম না।

কি ভেবে স্বামীকে সঙ্গে নিতে সুরু করলাম। সান্ধ্য ভ্রমণের নামে ওঁকে নিয়ে বেরোতাম, ফেরার পথে কর্তব্য হিসেবেই যেন স্মরণ করিয়ে দিতাম সুকান্তবাবুর শারীরিক খবরটা একবার নিয়ে যাবার কথা। স্বামী মোটেই মিশুক ন'ন, তবু সুজিতের সঙ্গে মোটামুটি তাঁর বেশ ভাব হ'য়ে গেল। স্বামীর সাজপোষাক সম্পর্কেও এ সময় আমি অকস্মাৎ অত্যধিক সচেতন হ'য়ে পড়লাম। নিজে বাজার ঘুরে পছন্দ মতো তাঁর ধুতি-পাঞ্জাবি-জুতো-রুমাল সব কিনেকেটে আনলাম। চুল আচড়ানো থেকে সামান্য চলনটির প্রতি রইলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সুজিতের সামনে ওঁর নিষ্প্রাণ শান্ত প্রকৃতি আর সেকেলে হাবভাব নিয়ে নিজেকে বড়ই লাঞ্ছিত বোধ করতাম। অহেতুক এক-এক সময় স্বামীর উচ্চ ডিগ্রির উল্লেখ করতাম সুজিতের সামনে—থেকে থেকে একটা দৈন্য বোধ কেবলই পীড়া দিতো। স্বামী খুশিই হতেন তাঁর প্রতি আমার এই যত্ন ও নজর দেখে। অবিশ্যি আকস্মিক এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতে না পারায়

অস্বস্তি তাতে থাকতো। মাঝে-মাঝে বলতেন, 'ব্যাপার কি বলো তো? তুমি যে আমাকে নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছ, বাবু না বানিয়ে ছাড়বে না দেখছি।'

কিন্তু কিছুতেই নিজেকে রোখা গেল না। স্বামীত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ ক'রে যে তরঙ্গ ব'য়ে গেল, তা সুজিতের মনেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে আমার চোখে গোপন রইলো না। সুরু থেকেই সুজিত সচেষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলো, স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'তে তার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। তার এই কর্তব্যবুদ্ধি অপমান করতো আমার অন্তরাত্মাকে।

সেদিন দুপুরে একা চলে গেলাম ওদের বাড়ি। গিয়ে নিরাশ হলাম, সুজিত বাড়ি নেই। হঠাৎ কি খেয়াল হলো, টেবিল থেকে লাল পেন্‌সিলটা নিয়ে ওর শিথানের একটু নিচে বিছানার চাদরের ওপর লিখলাম 'স্যরি', তারপর একখানা বইএর তলায় লেখাটা চাপা দিয়ে বাড়ি চ'লে এলাম।

কিছুক্ষণ পরেই এলো সুজিত। 'আপনি আমার বিছানায় কি সব আঁকিবুকি ক'রে এসেছেন?' হাসতে হাসতে বললো।

'আমি—না তো।' অবাক হবার ভান করলাম। 'বসুন।'

সুজিত বসলো। সামান্য পরিবর্তন দেখা গেল তার মুখের ভাবে। 'আচ্ছা, আমার সঙ্গে দেখা না হ'লে সত্যি আপনি দুঃখিত হন?'

'নয়তো কি মিথ্যে লিখে এসেছি।' স্থির দৃষ্টি মেলে তাকালাম ওর চোখে। এই প্রথম সুজিতও নিষ্পলক চেয়ে

রইলো চোখে চোখ রেখে। তারপর ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিলো। ওর মুখেচোখে ফুটে উঠলো সেই ভাব—কিন্তু উপায় নেই। এ কথার আভাসেও আমার মাথায় আগুন ধ'রে যায়। মনের জ্বালা চেপে রেখে বললাম, 'আপনি হাত দেখতে জানেন, দেখুন তো আমার হাতটা।' বাঁ হাতখানা বিছিয়ে ধরলাম ওর সামনে। 'এক গণক আমার হাত দেখে কি বলেছে জানেন—বিশ বছর বয়সে আমার জীবনে নাকি একটা ওলটপালট কাণ্ড হ'য়ে যাবে, এমন কি বিবাগীও হ'য়ে যেতে পারি—দেখুন তো সত্যি কিনা!'

'এ বিষয়ে আমার জানা নেই।' বিবর্ণ হেসে সুজিত বললো। ওর মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে। একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি এখন যাই—'

সুজিত চ'লে গেল। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলাম। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে যে-মানুষ কামনা ক'রে আসছি এই তো সেই মানুষ। তাকে বেঁধেও বাঁধতে পারছি কই—মাঝখানে উপায়-হীনতার দুস্তরতা। সে-বাধা লঙ্ঘন করার সাধ্য ও সাহস ওর মতো পুরুষের আছে—কিন্তু আমার, আমিও তো সাহসকে সম্বল করবো ব'লেই বেরিয়েছিলাম।

পরের দিন দুপুরেই আবার দেখা হলো। আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম ওর ছবি আঁকার ঘরে। অসমাপ্ত একটা ছবির সামনে সুজিত ব'সে আছে তুলি হাতে। কি ভাবছিলো সে-ই জানে। আমি যেতেই তুলি রেখে উঠে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। ধরা গলায় সুজিতই প্রথম সুরু করলো,

'আপনাকে—আপনাকে একটা কথা বলবো—' নিজে একটা চেয়ারে ব'সে বললো, 'বসুন—কাল থেকে কি ভাবে যে আমার সময় কেটেছে—'

সুজিতের মুখচোখ আর কণ্ঠস্বরের স্বাদ পেয়ে হঠাৎ আমার মধ্যেকার সেই খেলোয়াড়টা জেগে উঠলো। একটু আঘাত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। মুখের ভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক ক'রে নিয়ে বললাম, 'আপনি সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে পড়ছেন মনে হচ্ছে—'

মুহূর্তে সুজিতের মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। একটু দম্ ধ'রে থেকে বললো, 'হ্যাঁ, সেন্টিমেন্টালই বলতে পারেন—এটা প্রকাশ ক'রে আপনাকে সম্মানিত করলাম।' একটু থেমে ব্যঙ্গের সুরে বললো, 'আপনার তরফটা যদি অস্বীকার করেন তো বলতেই হবে, প্রেম আপনার কাছে প্রাণের বস্তু নয়, নিছক আর্ট মাত্র।'

'কোনো কিছুকে আর্ট ক'রে তোলা তো কৃতিত্বেরই কথা।'

একটু হাসলো। 'আর্ট চলে খাবার তৈরিতে, খাদ্যে নয়—গোটা খাদ্যটাই যদি আর্ট হ'য়ে ওঠে, তাতে স্বাদই থাকবে প্রাণ থাকবে না, তেমনি—থাক এ নিয়ে আলোচনা করতে আমার প্রবৃত্তি নেই।' তার মুখে দেখা দিলো বিতৃষ্ণা। 'আপনি অতিথি, আপনাকে যেতে বলতে পারি না, আমিই যাচ্ছি—' সুজিত দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

এ কি ক'রে বসলাম। ছুটে গিয়ে ওর পথ আগলে দাঁড়ালাম। মুখ তুলে চেয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে। একটু

বুঝি কাঁপছিলামও। গলা চেপে আসছিলো, অস্ফুট স্বরে বললাম, 'বাধা দেওয়া যে আমার কর্তব্য, সেটুকুও বোঝ না—'

ফিরে এসে ধপ্ ক'রে নিজের আসনটায় মুখ গুঁজে ব'সে পড়লাম। সুজিত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। দু'জনের মাঝে একটা টিপয়। তাতে দুটো কনুই রেখে সুজিত চেয়ে রইলো আমার দিকে। আমি মুখ তুলতেই চোখোচোখি হলো। দুজনেই স্থির হয়ে রইলাম। ওর কপালের শিরাগুলো স্ফীত হ'য়ে উঠেছে উত্তেজনায়। মনে হলো বিরাট একটা শক্তি স্তব্ধ হ'য়ে আছে আমার সামনে, বাঁধটা সামান্য একটু ভেঙে দিলে মুহূর্তে আমাকে ভাসিয়ে নেবে।

টিপয়ের ওপর একটা খড়কে প'ড়ে ছিল। তার এক মাথায় সামান্য লালচে পানের দাগ। ইচ্ছে করেই ওটা তুলে ধরলাম মুখে দেবার মতো ক'রে। সুজিত বললো, 'ওটা আমি মুখে দিয়েছি—' ওর কথা যেন কানেই যায় নি এমনি ভাব নিয়ে খড়কেটা মুখে পুরে উঠে দাঁড়ালাম। 'আমি যাই—'পা বাড়াতেই সুজিত এগিয়ে এসে তার সব শক্তি নিংড়ে আমাকে তার বুকের ওপর জড়িয়ে ধরলো।

পরের দিন খুবই সেজেছিলাম মনে আছে। আঁটো ছোট জামার ওপর নেট-এর একটা ব্লাউস, জর্জেট-এর ঝুলে-পড়া শাড়ির গা বেয়ে ফুটে উঠেছে দেহের প্রতিটি বক্ররেখা—আঁচলটাকে গুটিয়ে বুকের ওপর দিয়ে টেনে নিয়েছি ক্রস্‌বেল্ট-

এর মতো ঘষা-মাথায় চুলগুলো কপালের সামনে অলক হ'য়ে উড়ছে। সুজিতের শিল্পী-চোখ যে মুগ্ধ হবে সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম।

সুজিতের ঘরে ঢুকলাম। দু'হাত বাড়িয়ে আমার দুটো কাঁধ চেপে ধ'রে বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইলো। তার আঙুলগুলো আমার কাঁধের নরম মাংসের মধ্যে ক্রমে যেন ডুবে যাচ্ছিলো। স্নায়বিক উত্তেজনাকে ছাপিয়ে উঠলো শারীরিক ক্লেশ। হঠাৎ তার হাতের হিঁচকে টানে শাড়ির আঁচলটা খ'সে পড়লো। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা চাপা আর্তনাদ—ব্যথাকে অস্বীকার ক'রে এতক্ষণ যা গলায় আটকে ছিল। দু'হাত বুকে চেপে ব'সে পড়লাম।

কিন্তু সুজিতের শক্তির কাছে হার মানতে হলো। দাঁড় করিয়ে দিয়ে আদেশের সুরে বললো, 'বাধা দিও না বাব্‌লি'। আকস্মিক এই আক্রমণে আমার সভ্য মন ছিছি ক'রে উঠলো। কিন্তু পুরুষ-কামনার বর্বর প্রকাশের প্রতি নারী মনের গুপ্ত লোভটা ভয়-ভাবনার তলায় ব'সেও বেশ যেন খুশি হলো। লুণ্ঠনের এই অবিমিশ্র আগ্রহে নারীত্বের যে স্বীকৃতি কোনো শঙ্কার বাইরে নারী হ'য়ে তাকে বুঝিবা অস্বীকার করা যায় না। নির্মোক মুক্ত কম্পিত দেহে আমি তখন শুধু ভাবছিলাম এর পরের স্তরে নিজেকে আমি বাঁচাই কি ক'রে।

হঠাৎ কি ভেবে সুজিত একটু দূরে স'রে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো আমার সকল অঙ্গের ওপর দিয়ে। ক্রমে তার মুখ

থেকে কামনার ছায়া কোথায় স'রে গেল। 'যেমন দাঁড়িয়ে আছ তেমনি থাকো বাব্‌লি।' ব'লেই সে তুলি নিয়ে বসলো। ওর রক্ত-মাংসের মানুষটা এমন ক'রে হার মানলো ওর শিল্পী মনের কাছে, বিষয়টা আমার নারী-চরিত্রের কোথায় গিয়ে কাঁটার মতো বিঁধলো।

ক্রমে দু'জনের পরিচয় সান্নিধ্যের শেষ সীমায় গড়িয়ে গেল।

অতি গোপন সত্যও তার আভাস ছড়িয়ে দেয় পারিপার্শ্বিকে। স্বামীর মনে গুরুতর সন্দেহ দেখা দিলো। বাধ্য হয়েই নকল আদরে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলাম। এটা আমি দেখেছি প্রেমের ব্যাপারে পুরুষকে প্রতারণা করা সহজ। অবিশ্বাস করায় যে আত্মাবমাননা সেটা ওরা সইতে পারে না, বিশ্বাস করতে পারলেই যেন বেঁচে যায়। কিন্তু প্রেমই হলো আমাদের প্রাণ—তাই তার অস্তিত্বে আঘাত পড়লে মানসম্মান ভুলে আমরা মরিয়া হ'য়ে উঠি।

এই গোপন জীবন হয়তো চলতে পারতো আরো কিছুকাল। একদিন সুজিত বললো, 'আর নয় বাব্‌লি, এ লুকোচুরি আর সহ্য হয় না—নিজের ওপর নিজে শ্রদ্ধা হারাচ্ছি।'

'কি করতে চাও?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলাম।

'সকলের চোখের সামনে আমাদের এ সম্পর্ক স্বীকার করতে চাই—সাহস থাকে এগিয়ে এসো, নয়তো এখানেই ছেদ টেনে দাও।'

অন্তরে আমি উল্লসিত হ'য়ে উঠলাম। এই তো এসেছে সুযোগ, অবাঞ্ছিত বন্ধনে চরম আঘাত হানবার। নিজের সাহস

উপলব্ধি ক'রে নিজেই অবাক হ'য়ে গেলাম। বললাম, 'কিন্তু পালিয়ে আমি যাব না—মুখের সামনে ব'লে-ক'য়ে বিদায় নেবো।'

'তা পারবে না বাব্‌লি—তোমার স্বামী তোমাকে ছাড়বে না। সবাই চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াবে সাত-পাকের সম্মান বাঁচাতে।'

'তুমি জান না আমার স্বামীর গোঁড়ামির মাত্রা—একবার যদি আমাদের সম্পর্কের সীমা জানতে পারেন তো আমাকে আর আঙুল দিয়েও তিনি ছোঁবেন না—আমি ব'লে-ক'য়েই আসবো।'

পরের দিন রাত ন'টার মধ্যে শেষ বিদায় নিয়ে শুভ্রজিতের সঙ্গে এসে মিলবো প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম।

দরকারী কথার নাম ক'রে স্বামীকে সেদিন বিকেলে বেরুতে দিলাম না। আমার মুখের অবস্থা দেখেই তিনি ভড়কে গিয়েছিলেন, বার-বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কি কথা। ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। উনি উঠে বাতিটা জ্বালতে গেলেন, আমি আপত্তি জানালাম। আবছা অন্ধকারে ব'সে ব্যক্ত করলাম আমার জীবনের সত্য। স্বামীর মুখ ভালো দেখতে পেলাম না। তিনি উঠে ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ পাইচারি করলেন। কাছে এসে রুদ্ধস্বরে বললেন, 'যা হবার হ'য়ে গেছে, সব ভুলে যাও—এখন থেকে নতুন জীবন সুরু করতে চেষ্টা করো—কথা দাও আমাকে, তা-ই করবে',—কাছে এসে সজোরে হাত চেপে ধরলেন।

আমার দেহ ও মন থরথর ক'রে কাঁপছিলো। 'তা হয় না —আমাকে যেতেই হবে—এর পরও তুমি আমায় গ্রহণ করবে ?'

'করবো।'

লোকলজ্জার কাছে ওঁর আজন্মের সংস্কারও হার মেনে গেছে—ভীরুতা দেখে অশ্রদ্ধায় মন ভ'রে গেল। কি ভাবে সময় পার হলো টেরও পাই নি। ঢং ঢং ক'রে ন'টা বাজলো। আবিষ্ট সত্তা আঘাত খেয়ে জেগে উঠলো। দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি যাই—'

স্বামী জড়িয়ে ধরলেন। উত্তেজনায় তাঁরও শরীর কাঁপছে। 'আমার—নিজের—সর্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না বুঝি—তুমি কি পাগল হ'লে।' ঘন নিশ্বাস পড়ছে তাঁর। চেপে চেয়ারটায় বসিয়ে দিলেন।

মাথা ঘুরছে—অনেক চেষ্টায় চেতনাকে আঁকড়ে রইলাম। সময় পার হয়ে গেছে, তরে পরেও ব'য়ে গেল অনেকক্ষণ।

আমি যে কথা দিয়েছি—যেতে আমাকে হবেই। পরাজয়ের অপমান বরং ভালো—সংগ্রামে ত্রুটি রাখলে নিজের মনকে বুঝাবো কি দিয়ে! মরিয়া হ'য়ে নির্মম অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলাম। 'ওর সন্তান আমার শরীরে—এর পর নিশ্চয়ই—' জিভ জড়িয়ে আসছিলো, মুখ থেকে আর কথা সরলো না।

ক্রোধ মেশানো অসহিষ্ণু স্বরে স্বামী ব'লে উঠলেন 'তোমাকে যখন নিচ্ছি সবই আমি মেনে নেব, এখন থাক ওসব কথা।'

হঠাৎ স্বামী দেবতা হ'য়ে ওঠেন নি আমি জানি। এ তাঁর

মহত্ত্ব নয়, শুধু মান বাঁচানো। ভয়ের এই নোংরা রূপ দেখে ঘৃণায় মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছি এমন সময় দরজায় কড়া নড়লো। বাইরের ঘরেই আমরা ছিলাম। সেখানে কাউকে আসতে দেবার মতো অবস্থা তখন নয়। দরজা খুলে উনি বাইরে গেলেন, ওঁর গা ঘেঁষেই একটি লোক ঘরে ঢুকলো—ঢুকেই আলোটা জ্বেলে দিলো। দেখি সুজিত।

স্বামী ছুটে এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন সুজিতের দিকে।

'ন'টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে, তাই জানতে এলাম কোনো কারণে মত তুমি বদলেছ কিনা।' শান্ত স্পষ্ট কণ্ঠে সুজিত জিজ্ঞেস করলো।

আমার সমগ্র সত্তা কেঁপে উঠলো। এতক্ষণ বুঝিবা মেরুদণ্ডহীন স্বামীত্বকে আঘাত করছিলাম মাত্র। এবার সত্যি সব ছাড়তে হবে। বাঞ্ছিত জন ও জীবনের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও মনের গভীরতম তলদেশ থেকে একটা আবেদন উঠে মনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়লো—ওগো আমাকে তোমরা ধ'রে রাখো, একে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। মুখে বললাম, 'মত আমার বদলায় নি'—বহু শতকের শক্ত মুঠোয় ক্ষীণ একটু আকর্ষণের মতোই স্তিমিত কণ্ঠ থেকে বেরোলো, 'চলো—'

স্বামী হাতটা চেপে ধরলেন। সুজিত তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

নিজেকে আর একবার সামলে নিয়ে অনেক কষ্টে বললাম, 'তুমি যাও—অপেক্ষা ক'রো, আমি ঠিক আসবো—'

সুজিত বেরিয়ে গেল। চোখ বুজে ব'সে পড়লাম।

চাকরকে আড়ালে ডেকে স্বামী কি বললেন জানি না। একটু পরেই দরজায় মোটর থামার শব্দ হলো। স্বামী হাত ধ'রে টেনে তুললেন, ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে বললাম, 'না, আমি কোথাও যাবো না—জোর করো তো চিৎকার করবো।'

'বেশ তাই করো, তবু যেতে হবে।' হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললেন।

চিৎকার কিন্তু আমি করলাম না—

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হ'য়ে আসছিলো। মাথাটা ঝুলে পড়লো একপাশে। আবছা শুনতে পেলাম, স্বামী বলছেন, 'শেষে যে-কথাটা বললে—সুজিত তা জানে?'

অর্ধচেতন অবস্থায় গলা দিয়ে বেরোলো—'না—'

স্বস্তির শ্বাসের মতো একটা শব্দ কানে এলো—অগাধ অন্ধকার তখন আমাকে ঘিরে ফেলেছে।

সে কি অন্ধকার—যেন আঁজলা ভ'রে তুলে নেওয়া যায়।

খাতা খুড়িবেন না

আমি

ভালো ক'রে আলো দেখা দেয় নি। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে একটি দু'টি লোক এসে জড়সড় অবস্থায় দাঁড়াতে থাকে একটি বন্ধ দরজার সামনে। একের পেছনে আর একজন—ক্রমে নরনারী গঠিত এক-মানুষ পুরু একটি রেখা ফুটপাথ ধ'রে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হয়।

শীতের সকালে শীতবস্ত্রহীন মানুষগুলো সোজা দাঁড়াতে পারে না। কেউ গুটিসুটি মেরে ব'সে পড়ে, কেউ জড়সড় অবস্থায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায় দেয়ালে। একটু একটু ক'রে দিনের আলো স্পষ্ট হয়। রাস্তায় সুরু হয় লোক চলাচল। পথ-চারীরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সরকারের বাঁধাদরে চাল কেনায় খদ্দেরের মজার ভিড়। দেখবার লোক আরও আছে—আশপাশের বড়-বড় বাড়ির ঝুলবারান্দায় প্রাতরাশ সেরে যে-সব স্ত্রী-পুরুষ এসে দাঁড়ায় তারা শুধু দেখে না, রীতিমতো উপভোগ করে। লাইনটা যেদিন যত বেশি লম্বা হয় দৃশ্যটা হয় ততই উপভোগ্য। একেবারে লেজের দিকের লোকগুলো, দূরত্বের জন্য মুখ যাদের স্পষ্ট দেখা যায় না, তাদের হ'য়ে দু'চারটা সহানুভূতির কথা না বলে এমনও নয়। কারণ তারা দেখেছে শেষের লোকটিকে পর্য্যন্ত শেষ অবধি ঠায় দাঁড়িয়ে

থাকতে হয়। ত্যক্ত হয়ে স'রে কেউ পড়ে না। পড়া বোধ হয় সম্ভবও নয়—এতো আর ফুটবল বা সিনেমার টিকিট নয়। এ হ'লো সঞ্চয়হীন গৃহের নিত্যখোরাক।

লোকগুলোর বিড়ম্বনা আজ বেড়ে গেল। অসময়ে আকাশটা ছিল মেঘলা ক'রে। টিপটিপে বৃষ্টি নামলো। লোকগুলো নড়েচড়ে উঠলো। কয়েকটা পুরোনো ছাতা পটাপট খুলে গেল লাইনের এখানে-ওখানে। এই নড়াচড়ার সময় কে একজন ঢুকে পড়েছে লাইনের মাঝখানে—পেছনের জনকয় মিলে তাকে বের ক'রে দিতে চায়। লোকটাও ভারি বেয়াড়া, সে কিছুতেই বেরুবে না। একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে দেওয়াই যেন তার ইচ্ছে—তাতে হয়তো আরও কিছুটা সামনে স্থান ক'রে নেওয়া সম্ভব হবে।

শীতের শেষরাতে উঠে যারা লাইনে দাঁড়ায় চাল কিনতে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যাদের বেলা বারোটা অবধি, যাদের লাইনের এখান-ওখান ভেদ ক'রে ভিন্ন দোকান থেকে চড়া দরে চাল বেরিয়ে যায় মণে-মণে, কোনো কারণেই যে ক্রোধ তাদের উদ্দীপ্ত হ'তে পারে ভাবা যায় না। কিন্তু দেখা গেল রাগ তাদেরও হয়। এরই মধ্যে থেকে দু'চারজন মারমুখো হ'য়ে ওঠে। বেধে যায় বড় রকমের একটা হট্টগোল আর ঠেলাঠেলি। সামনের লোকগুলো পেছনে পড়ার ভয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে বন্ধ দরজাটার গায়ে। সবারই মুখে ক্রোধের স্পষ্ট ছাপ্। দরজার উপর যারা পড়েছে আপ্রাণ চেষ্টায় তারা পেছনের ধাক্কা

সামলায়—দরজা ভেঙে গেলে যে পড়বে গিয়ে চালের আড়তে—ক্রোধে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না, শুধু কোলাহল করে।

উল্টো দিকের একটা পুরোনো দোতলা বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে বিভুপদ দাঁত খিঁচিয়ে আপন মনেই ব'লে ওঠে, 'ভেড়ার বাচ্চা শালারা—না খেয়ে মরবে তবু গুঁতোবে না—' রুদ্ধ উত্তেজনায় বিষিয়ে ওঠে তার সমস্ত দেহটা। বিড়বিড় ক'রে বকতে-বকতে জানালার সান্নিধ্য থেকে সে স'রে এলো। হাতল-ভাঙা চেয়ারটা সশব্দে টেনে নিয়ে ধপ্ ক'রে তাতে ব'সে পড়লো। মনে পড়লো, একটু পরে তাকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে এমনি একটি লাইনের অঙ্গ হয়ে—সের কয় কয়লার অপেক্ষায়। সে-অপেক্ষা সফল হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিরক্তিতে গা'টা তার রি-রি ক'রে ওঠে। মেজাজের উচ্চতম পর্দা যদি সপ্তম হ'য়ে থাকে তবে তার মেজাজ তখন সপ্তমে। সব রাগ গিয়ে কেন্দ্রীভূত হ'তে চাইলো চাকরটার ওপর। কিন্তু পুরো মনটা সায় দিলো না, ও বেটা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে আর সব কাজ সামলাবে কে। চাপা ক্রোধটা বিরক্তির অসংখ্য ছিদ্রপথ ধ'রে ছড়িয়ে গিয়ে তিক্ত ক'রে তুললো সব কিছু।

ইতিমধ্যে এক পেয়ালা চা আর একটা ডিস্-এ খান তিন বিস্কুট চাকরটা রেখে গেছে। ডিস্‌টার দিকে চোখ পড়তেই ভ্রূ দু'টো তার কুঁচকে গেল। বিস্কুট আর ডিস্-এর মাঝখানে দোকান থেকে জড়িয়ে দেওয়া কাগজটা। বেটা ইডিয়ট—ক'দিন যাবৎই সে দেখছে, আজ আচ্ছা করে সমঝিয়ে দেবে—এই

সাধারণ বুদ্ধিটা পর্যন্ত ঘটে নেই। কাগজটা টান মেরে সে হাতে তুলে নিলো—সেই ম্যাট্রিকুলেশন-এর ইংরেজীর নোট থেকে আর এক পাতা। কদিন ধ'রে রোজ সকালে একঘেয়ে একপাতা ক'রে আসছে—উঃ, কদ্দিন খেয়ে এই বইটা সে ফুরোবে! গত দু'দিনকার দুটো পাতা তখনো ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে, চাকরটার ওপর ঝাল ঝাড়বার আর একটা কারণ জুটলো—দু'দিন যাবৎ বেটা ঘর ঝাঁট দিচ্ছে না। বিভুপদ পাতা দুটো কুড়িয়ে আনলো। নম্বর মিলিয়ে দেখলো মাঝের গোটাচারেক পাতা মোটে নেই। কী দোকান—তিন দিনে সে ছাড়া আর চারটি খদ্দের মাত্র জুটেছে। আর জুটবেই বা কি ক'রে, লোকের কি আর বিস্কুট খাওয়ার মতো পয়সা আছে। যে বিস্কুট ছিলো পয়সায় চারখানা তারই একখানা বিকোচ্ছে আজ এক পয়সায়। বিকোবেই বা না কেন—যেখান দিয়ে পারছে মানুষ মানুষের টুঁটি টিপে ধরছে। অন্নবস্ত্রই জুটছে না—আর বিস্কুট—ব্যাবসায়ীদের হৃৎপিণ্ডটা খুঁড়ে দেখতে ইচ্ছে হয় বিভুপদর, সেটা কি বস্তু দিয়ে তৈরি।

ঠাণ্ডা চা—এক চুমুকে বিভুপদ গিলে ফেললো। শুকনো চওড়া চোয়ালের বিকৃত ভঙ্গিতে বিস্বাদটা মূর্ত হয়ে উঠলো তার মুখে। চোখ তুলতেই নজরে পড়লো বাতির ওপর জড়ানো দৈনিক কাগজটা—তাপে আর ধুলোয় তামাটে হ'য়ে গেছে। যে কোণটা চোখের সামনে ঝুলছে তাতে গলিতকুষ্ঠের বিজ্ঞাপন। চেয়ারে দাঁড়িয়ে সরোষে কাগজটায় মারলো এক টান। ধ্যাত্তরি

ব্ল্যাকআউট—আলো জ্বেলে অন্ধকারে ব'সে থাকা, আজ থেকে সে মোমবাতি জ্বালবে।

কয়লার কথাটা মনে পড়ে—হেঁচকা টানে জামাটা নিয়ে গায় চড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। কয়লা নেই, চাল নেই, নেই জামাকাপড—এমন কি ঘরের বৌটাও নেই, বোমার ভয়ে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে পিত্রালয়ে—নিখরচায় রাখার একমাত্র আশ্রয়। ছোটছেলে নন্তুর মুখটি মনে পড়ে, বিরক্তিতে বিষিয়ে ওঠা মনটা হঠাৎ যেন একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে।

ঘুরেফিরে আবার সে এসে দাঁড়ালো জানালার কাছে। সামনের বড় বাড়িটার দোতলায় থাকে এক রিটায়ার্ড অফিসর। বি-এ পাশ মেয়েটি তার যোগ দিয়েছে মেয়ে-সৈনিকের দলে। খাকি শাড়ির ওপর খাকি কোর্তা চড়িয়ে গটমটিয়ে উঠলো গিয়ে মিলিটারি বাস-এ। বিভুপদর দীর্ঘ মেরুদণ্ডটা ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে—আগ্রহে না ভাবনার ভারে বোঝা যায় না। তেতলার বারান্দায় ছিপছিপে বৌটি গা ছেড়ে পাইচারি করছে, মাঝে-মাঝে বাঁ পাশ ফিরে দু'হাত উঁচিয়ে চুল বাঁধে—উল্টো দিকের চোখগুলো যেন চোখেই পড়েনি। শাড়ির সামনের কোঁচাটা সামান্য তুলে ধরার জন্যে আলতো ক'রে হাতটা এমন ভাবে রাখে, দেখে বিভুপদর মাথায় যেন আগুন ধ'রে যায়। তার অনুপস্থিতিতে তার বৌও এমনি সব হাবভাব করে নাকি!

দড়াম ক'রে জানালাটা সে বন্ধ ক'রে দিলো। নাঃ কোন দিক দিয়ে সুখ শান্তি আস্থা আনন্দ কিচ্ছু নেই।

বাড়িঘর কাঁপিয়ে দুরন্ত শব্দে ট্রামটা বেরিয়ে গেল, দু'কান বন্ধ ক'রে বিভূপদ উঠে দাঁড়ালো। এক টুকরো চট মুড়ে নিয়ে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল কয়লার উদ্দেশে।

বাপস্ কি ভিড় দোকানের সামনে! মানুষের চাপে কয়লা হীরে হ'য়ে গেছে। আর এক দরজা দিয়ে ট্রাকের পিঠে বা কুলির মাথায় চ'ড়ে মণে-মণে কয়লা বেরিয়ে যাচ্ছে বেয়ারা চাপরাসির সঙ্গে। গলদঘর্ম হ'য়ে পাঁচ সের কয়লা নিয়ে ফিরলো বিভূপদ। ধপাস্ ক'রে পুঁটলিটা ফেলে ছুটে গেল স্নান করতে—দশটা বেজে গেছে, আজ আর রক্ষা নেই।

আপিসে যেতেই ডাক পড়লো ম্যানেজারের ঘরে। ম্যানেজার ঘড়ি দেখিয়ে বললো, 'ক'টা বাজে, চাকরি করার ইচ্ছে আছে না নেই—যত সব ইরেস্পনসিবল্—'

'আজ্ঞে কয়লার—'

'কথা হচ্ছে আপিসে আসা নিয়ে, আপনি বলছেন কয়লা—শিয়ার নন্সেন্স—'

ম্যানেজার-এর এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে তার কথায় সায় না পড়লেই সে ভয়ানক চ'টে যায়।

টেবিল চাপড়ে ব'লে উঠে' 'কি, চুপ ক'রে রইলেন যে?'

কি বলতে পারে বিভূপদ? তার কি স্বীকার করতে হবে, হ্যাঁ তার কথাগুলো অসঙ্গত অর্থহীন!

'ইজ নট ইট ফুলিশ?' সপ্রশ্ন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ম্যানেজার তাকায়। উত্তর তার একটা চাই-ই।

বিভুপদর ইচ্ছে হলো লোকটার ব্রহ্মতালুতে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে স'রে পড়ে, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুলো 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হু'হাতে মাথা রেখে কিছুক্ষণ সে উপুড় হ'য়ে রইলো লেজারের ওপর। শিক্ষিত ভদ্রলোক সে, সুট প'রে আপিসে আসে, দোকানের সামনে ছোটলোকদের লাইনে দাঁড়াতে তার লজ্জা হয়—আরো কতশত লজ্জা বাঁচানোর জন্তে প্রাণান্ত—কিন্তু সত্যি কে সে—কেউ নয়। কিছুই সে নিজে করছে না, সকাল থেকে সন্ধ্যা চড় মেরে-মেরে তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে কেবল। শুধু বেঁচে থাকার জন্তে অসংখ্য লাঞ্ছনা স'য়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো সার্থকতা নেই তার সত্তার। ভাবতে ভাবতে এরই মধ্যে সে অভ্যাস মতো অঙ্ক কষতে সুরু করলো।

টিফিনের সময় কিছু করার নেই ব'লেই সে চুপচাপ ব'সে ছিল। বেয়ারা এসে জানালো কে একটি বাবু ডাকছে। ধমকের মতো ক'রে বিভুপদ ব'লে উঠলো, 'কে—কে ডাকছে—'

খুবই বিরক্তি নিয়ে উঠে গেল বিভুপদ।

গিয়ে দেখে তার ভাগ্নে সুনীল। ভ্রূ কুঁচকে বললো, 'কি রে, কি চাই?'

'এই এদিকে এসেছিলাম, এলাম একবার দেখা করতে।'

'দেখা করতে—কেন দেখা করবার দরকারটা কি—এদিকে এসেছিলি তাই, না—'

মামার মেজাজ দিন-কে-দিন খিটখিটে হ'য়ে যাচ্ছে তার

পরিচয় সুনীল ইতিপূর্বেও পেয়েছে। কথার মোড় ফেরাবার জন্যেই সে বললো, 'ট্রাউজারের বোতামটা খ'সে পড়ছে—'

কোমরের নিচেই সামনের একটা বোতামের সেলাই ঢিলে হয়ে গেছে। একবার দেখে নিলো বিভুপদ। 'বেশ হয়েছে—হবে না, কোনো খবর তো রাখিস নে—' তিক্ততা ফুটে উঠলো তার মুখচোখের ভাঁজে ভাঁজে।

বোতামের উল্লেখটা এতখানি গুরুতর হবে সুনীল ভাবতে পারে নি। একটা বোতাম ঢিলে হবার পেছনে জ্ঞাতব্য একটা ইতিহাস আছে বেচারা জানবে কি ক'রে। আরও বিব্রত হ'য়ে সে তাকালো মামার মুখের দিকে।

'বোতাম—হুঁঃ—কিসের মধ্যে আছি জানিস?' তেমনি ধমকের সুরেই বিভুপদ বলতে লাগলো। 'এদিকে এসেছিলি তাই এলি খবর নিতে। খবর নিতে হ'লে বাড়ি যেতে হয়। পর পর বিপদ লেগেই আছে। এই তো সেদিন পাইখানায় তোর মামীর পা'টা পিছলে পড়লো প্যান-এর মধ্যে—' হঠাৎ গলার স্বর নিচু হলো। 'প্যান ভেঙে পা-এর মধ্যে এতটা ঢুকে গেছে—বাড়িওলা এখনও টের পায় নি, জানলে হয়তো প্যান-এর দামই আদায় ক'রে ছাড়বে—যত ঝামেলা—'

বাড়িওলা শুনতে পাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই, তবুও কথাগুলো বলে বিভুপদ চাপা গলায়।

চিন্তিত হ'য়ে সুনীল বললো, 'প্যান-এ পা কেটে যাওয়া তো ভালো নয়।'

'কে বললো ভালো—আমি বলেছি? দেখতে দেখতে পা তো ফুলে ঢাক—একশো তিন জ্বর—' বিভুপদর চোখে ভয়ের অভিব্যক্তি। 'তার ওপর নন্তুর আমাশয়, এদিকে আমার সর্দিজ্বর। দিন চারেক হলো ভাত খেয়েছি—চেহারা দেখে বুঝতে পারিস্ না?'

মাথা নেড়ে সুনীল জানায় সে বুঝতে পেরেছে। 'মামীকে তো তক্ষুনি একটা ইন্‌জেকশান দেওয়া উচিত ছিল—নন্তু আছে কেমন? আজই একবার যেতে হবে। এ জানলে কি আর—'

'আজ গিয়ে আর কি হবে। তোর মামীকে পাঠিয়ে দিয়েছি তার বাবার কাছে—ওরা কেউ নেই এখানে।'

'এখন কেমন আছে খবর পেয়েছ?'

'খবর আবার পাবো কি—ভালো না থাকলে এতদূরে পাঠালাম কি ক'রে।' বেশ শান্তভাবে বিভুপদ বললো। 'ওঃ তার ওপর মস্ত কাজ জুটেছে, কিউতে দাঁড়িয়ে কয়লা কেনা—' কথাটা স্মরণ হ'তেই তার সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো বিরক্তিতে আবার মোচড় মেরে উঠলো।

দুশ্চিন্তার পরিবর্তে এবার কৌতুক বোধ করলো সুনীল। 'মীরার বিয়েতে যাচ্ছ তো তুমি নিশ্চয়ই?' সে জিজ্ঞেস করলো। 'আমার ওপর যে কত কাজ চাপিয়েছে—'

মীরার বিয়ে, বিভুপদ কোনো খবরই পায় নি। মীরাদের সঙ্গে সুনীলের আত্মীয়তা তারই সম্পর্কের সূত্র ধ'রে কিন্তু খবরের বেলায় সে-ই পড়েছে বাদ।

'যাব কি, বিয়ের খবরই আমি জানি নে। ওরা আমার খোঁজ নেবে কেন—বেছে বেছে খোঁজ নেবে তাদের, যাদের টাকা আছে। পশু, সব পশু—ওদের নামও আর উচ্চারণ করিস নে আমার সামনে—আমি কেউ নই কারুর—' বিতৃষ্ণায় সে মুখ ফেরালো। হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'শোন্ সুনীল, বাড়ি গিয়ে তৈরি হ'য়ে নে, আজই তোর যেতে হবে ফরিদপুর—তোর মামীকে নিয়ে আসতে হবে।'

'এখন সবাই কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছে, এখন ফিরিয়ে আনা—'আর কয়েকটা দিন দেখা উচিত নয় কি?'

'সে ভাবনা তোর ভাবতে হবে না। সে আমি বুঝি। আজই যেতে হবে—কি, যেতে পারবিনে?'

আবার একটা ঝাঁঝি খাবার আশঙ্কায় সুনীল ভয়ে-ভয়ে বললো, 'পারবো।'

সুনীল জানে মামা-মামীর মধ্যে খুব একটা বনিবনা নেই। দিনরাত খিটিমিটি লেগেই আছে। মামা দিনের ভিতর বহুবার ঘোষণা করে, এই স্ত্রীলোকটিই তার জীবনের সব শান্তি মাটি করেছে। সেই মামীকে ছেড়ে ক'টা দিনও মামা কাটাতে পারছে না—বোধ হয় কলহ করবার লোক জুটছে না ব'লে। সাময়িক মুখের হাসিটা মুলতুবি রাখে সুনীল।

দিন কয়েক পরেই মেঘাচ্ছন্ন মুখ নিয়ে কণিকা ফিরে এলো বাপের বাড়ি থেকে।

কণিকা ফিরে আসার পর বাড়ির আবহাওয়াটা কি রকম

দাঁড়িয়েছে তা আমরা অনায়াসে আঁচ করতে পারবো স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপের এই সামান্ত অংশটুকু থেকেই।

আপিস যাবার মুখে বিভুপদ বলছে, 'কি, অমন মুখগোমড়া ক'রে আছ কেন—কথা কইলে জবাব দাও না, জিভটা কি বাপের বাড়ি রেখে এসেছ ?'

'শান্তিতে থাকা আমার সইবে কেন যেমন আমার কপাল—মুখ ঝামটা দেবার জন্তে হিঁচড়ে টেনে আনা হলো দু'দিন না যেতেই।'

'বাপের বাড়ি থাকার যখন এতই সখ, আমি মরি তারপর পাকাপোক্তভাবে গিয়ে বাপের ঘাড়ে চেপো—আর মরবোও শিগগিরই, তোমার মতো একটা মেয়েমানুষ যার ঘাড়ে চাপে তার না ম'রে উপায় আছে—'

চোখের জল ফেলে কণিকা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাস্তায় পা বাড়িয়ে বিভুপদ দেখতে পেলো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে জটলা করছে পাড়ার ছেলের দল। একজনের হাতে একটা খাতা আর কলম—পাড়ার বারোয়ারি সরস্বতী পূজোর চাঁদা তুলছে। গলা ছেড়ে বলাবলি করছে কে কত মোটা চাঁদা দিয়েছে, এখন যাবে আর কার কাছে—ইত্যাদি। বিভুপদ পাশ দিয়ে হেঁটে যায় একবার তারা চোখ তুলেও চায় না। বিরক্তিতে বিভুপদর ভেতরটা জ্বালা ক'রে ওঠে। কেন ওরা কি তাকে মানুষ হিসেবে আমলেই আনেনা নাকি ! তার অবস্থা অনুযায়ী সে না হয় চার আনা দেবে, তা ব'লে ছোকরারা আসবেই না তার কাছে—কেন,



সেও তো পাড়ার একজন বাসিন্দে। ঢলঢলে ছেঁড়া প্যাণ্টলুন আর মুড়িতে মুড়িতে সুতোখসা কোট পরে ব'লে তাকে গণ্যই করবে না এ কেমন কথা! এসে একবার দেখতো তার কাছে, হয়তো বা একটা টাকাই সে দিয়ে দিতো—ইচ্ছে করলেই পারে সে অমন একটা টাকা ছুঁড়ে দিতে। এসব ফাজিল ছোকরাদের ধ'রে ক'ষে চড়িয়ে দিতে হয়। এই সামান্য কাজটুকু পর্যন্ত সবদিক বজায় রেখে করতে জানে না। বারোয়ারি ব্যাপারে এই যে একটা টাকা কম সংগ্রহ হলো এ জন্যে রীতি-মতো এদের শাস্তি হওয়া উচিত।

সেদিন আপিসে ছুটির একটু আগে ঢুকতে হলো তাকে ম্যানেজারের ঘরে—একটা সই নেওয়া দরকার। কাগজপত্র সুদ্ধু লেজারটা খুলে ধরলো সামনে। ম্যানেজার কথা বলছে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। কথা সে ব'লেই চললো, সঙ্গে সঙ্গে গদাইলস্করি চালে কলমটা নিলো হাতে, তারপর ধীরেসুস্থে খুললো টুপিটা, ক্রমে সে টুপি কলমের পেছনেও সওয়ার হলো কিন্তু তারপর হাতের কলম হাতে রইলো—তিনি কথাই বলছেন।

ভীমাকৃতি অতবড় একটা ভারি বই—বিভুপদর হাতের শিরাগুলো টনটন করতে থাকে। কিন্তু বইটা বন্ধ করতেও সে ভরসা পায় না, হয়তো তক্ষুণি হাত বাড়িয়ে ধমকে উঠবে। রাগে ভেতরটা তার মোচড়াতে থাকে।

সই হলো প্রায় আধঘণ্টা পরে।

বাইরের জগৎ যতই শত্রুতা করুক হাত দুটোর সদ্ভাব নষ্ট

হয় নি এখনো—একে অন্যকে দলাইমলাই ক'রে যথাসম্ভব সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলো।

ট্রামে চাপলো বিভূপদ। রাগটা তখনও ভেতরে ভেতরে পাক খাচ্ছে। মনে-মনে সহস্র বার ম্যানেজারের ভুঁড়ির ওপর পা রেখে ক'ষে তার কান ম'লে দিলো। ট্রাম থেকে নেবে গলির মুখে ঢুকতেই কে একজন পাশ থেকে ব'লে উঠলো, 'কি মশাই সুট প'রে সুট ক'রে স'রে পড়ছেন যে—যেন দেখতেই পান নি—আমার টাকা ক'টা—'

সস্তা রসিকতায় অপমানের জ্বালাটা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। খুব কয়েকটা কড়া-কড়া কথা বিভূপদর জিভের ডগায় এসেই থেমে গেল। বলবার সময় বললো, 'দেব মশাই—যা দিনকাল পড়েছে দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

'দিনকালটা তো মশাই আপনার একার নয়।'

বিভূপদ জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে তখন সে লোকটাকে পাওনার চেয়ে দশটাকা বেশি ফে'লে দিয়ে তারপর কড়া হাতে ভদ্রতা শেখাচ্ছে।

বাঁকা দেহটা আর একটু বেঁকে পড়লো বিভূপদর। ফুট-পাথের ওপর চোখ রেখে ঢিলে পদক্ষেপে সে এগিয়ে চললো। যৌবনের মৃত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো মনের প্রেতলোকে ঘুরে-ফিরে কেবলই বলতে থাকে—তুই কে—কেউ না—

বিভূপদ বাড়িতে ঢুকতেই কণিকা রান্নাঘর থেকে ডেকে বললো, 'এই রাম, বাবু এসেছেন, হাত মুখ ধোবার জল দে!'



এ কটা দিন একক জীবনযাপনের পর কথাটা আজ হঠাৎ যেন বিভুপদর কানে বেজে উঠলো অপ্রত্যাশিত ঘোষণার মতো—'বাবু এসেছেন, হাত মুখ ধোবার জল দে—'

সারাদিনের গ্লানিলিপ্ত অন্ধকার পটভূমিকায় অকস্মাৎ তার অস্তিত্ব যেন বিঘোষিত হলো আলোর আখরে। স্ফীত হয়ে ওঠে তার বুভুক্ষিত ব্যক্তিত্ব—বিভুপদ এসেছেন—বিভুপদ কর্তা—পা ফেলতে গিয়ে তার পুরোনো জুতোর গোড়ালিটাই যথাসম্ভব শব্দ ক'রে ওঠে।

ঘরে ঢুকেই দেখে নন্তু কাঁদছে। গলা ছেড়ে বিভুপদ হাঁক দিল, 'কই—কোথায়—আঃ, বাড়ি ফিরে যে একটু শান্তি পাব তারও উপায় নেই!'

কণিকা ছুটে এসে সরিয়ে নিয়ে গেল নন্তুকে। আড়ালে গিয়ে চাপা গলায় ধমক দিল ছেলেকে, 'চুপ, বাবা এসেছেন, কাঁদলে বকবেন কিন্তু—'

খট্ খট্ পা ফেলে খানিকক্ষণ পাইচারি করলো বিভুপদ ঘরের মধ্যে। শত আঘাতে সংকুচিত নিজেকে মনে হতে লাগলো অনেকখানি বিস্তৃত। এই পুরোনো আসবাবপত্র, স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, মায় ভাড়াটে-বাড়ি, সবারই মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে তারই সত্তার মহিমা।

হাতমুখ ধুয়ে শিরদাঁড়া খাড়া ক'রে বিভুপদ চা পান করে। হঠাৎ যেন বড় বেশি রাশভারি হয়ে গেছে।

একটু হালুয়া মুখে তুলেই ডিসটা হাত দিয়ে গম্ভীর ভাবে ঠে'লে দেয় কেবল, বিকৃত মুখে ঝাঁঝি মেরে ওঠে না।

'কি, সরিয়ে রাখছো যে, খাবে না?' কণিকা জিজ্ঞেস করলো।

'খাদ্য হলে তো খাব।'

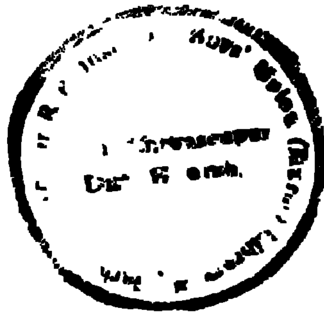
'বোসো, আবার ক'রে আনছি।' কণিকা ম্লানমুখে বললো।

কণিকার মুখভাবটা বেশ উপভোগ্যই মনে হয় বিভূপদর কাছে।

'বসবার সময় কোথায়—ব'সে থাকলে যদি চলতো, কথাই ছিল না—' গম্ভীরভাবে বিভূপদ উঠে দাঁড়ায়।

দু'খিলি পান মুখে পুরে সে বেরিয়ে পড়ে। চিবোনোর প্রতি চাপে ব্যক্ত হয় দিনান্তের গ্লানিহীন তৃপ্তি—

অনেক দিন পরে আজ সে এগিয়ে চলে ব্রিজ খেলার আড্ডার উদ্দেশে।



ভঙ্গুর

চল্লিশ টাকার ভাড়াটে বাড়ির সঙ্গে আর সব কিছুই ঠিক-ঠিক মানিয়ে গেছে, মানায় না শুধু সজীব ও নির্জীব মূর্তি কয়টি। সজীবের মধ্যে সপরিবারে দুর্গানারায়ণ আর নির্জীবের মধ্যে তাঁর প্রপিতামহের একটি প্রস্তর-মূর্তি। পরিবেশে মানুষ কয়টিকে যদিই বা সহজ ভাবে গ্রহণ করা যায়, প্রস্তর মূর্তিটির প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করার উপায় থাকে না। মূর্তিটি দাঁড় করানো রয়েছে দুর্গানারায়ণের শোবার ঘরে। যেখানে আসবাব বলতে যুক্ত দুটো তক্তাপোশ, টেবিল, আলনা, চেয়ার, গুটিকয় বাক্সো সুটকেস—এ ধরনের অতি সাধারণ কয়েকটি নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু। তারই একপাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কোনো এক নিপুণ শিল্পীর হাতেগড়া এই পাথরের মূর্তি। মাথায় তার মহামূল্যের পাগড়ি—যার মাঝখানে ঝুলছে একটা মূল্যবান পাথর—পরিচ্ছদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাবতে গেলে হীরে বলেই মনে হয়, গায় ব্রকেডের কাজ করা আচকান, পরনে যোধপুরী পাজামা, বাঁ পাশে একটা বাঁকা তলোয়ার—হাতলটা যার মুঠো

ক'রে ধরা। তলোয়ারের নিচের অংশটা এখন আর নেই, স্থানান্তরিত করতে গিয়েই হয়তো বা ভেঙে গেছে। নিখুঁত ভাস্কর্য। পাথরের স্থুলত্ব অব্যাহত রেখে প্রতিটি রেখা তার স্পষ্ট ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে।

দুর্গানারায়ণ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন শুধু ঐশ্বর্যের ইতিহাস আর সেই সঙ্গে সম্পদের শেষ চিহ্ন এই প্রস্তর মূর্তি। এই মূর্তিটিও হয় তো বা টিঁকে গেছে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি ব'লেই। যে কারণেই হোক শেষ অবধি এটা ছিল এক কোণে প'ড়ে ধূলিমলিন অবস্থায়। ভাস্কর্য না পুরোনো দিনের শেষ নিদর্শন হিসেবে এটাকে দুর্গানারায়ণ সঙ্গে এনেছিলেন বলা যায় না।

দুর্গানারায়ণ কাজ করেন একটা সওদাগরী আপিসে। পদমর্যাদাও কিঞ্চিৎ আছে। আপিসে বা বাইরে কোথাও কারুর সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা নেই। মুখেচোখে অনুমান গৌরবের স্তিমিত দীপ্তি ও গাম্ভীর্য। পারিবারিক লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার একটা দৃঢ় সংকল্প তাঁর মনের তলায়। সন্ধ্যায় দুই পুত্রকে দু'পাশে নিয়ে গল্প বলেন—বিগত ধনৈশ্বর্য আর বংশমর্যাদার গল্প। পাথরের মূর্তিটার উপর চোখ রেখে দুর্গানারায়ণ ব'লে চলেন, 'সেই ধন-দৌলত, সেই প্রতাপ আজ কোথায়! ইনি হাঁক ছাড়লে হাজারো প্রজা এসে জড়ো হতো বাড়ির সামনের ময়দানে। একবার একটা গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন অবাধ্য এক প্রজাকে তারা ধরিয়ে দেয়নি

ব'লে। অন্যায়ে যেমন ছিলেন নিষ্ঠুর তেমনি আবার দুঃখ-দারিদ্র্যে দয়ারও তাঁর অন্ত ছিল না। তিনি কি বলতেন জানিস্, বলতেন, আমরা না দিলে ওরা বাঁচবে কি ক'রে—এঁরই বংশে তোদের জন্ম—'

আট বছরের ছেলে দিব্যেন্দু স্তব্ধ হয়ে শোনে। পাথরের মূর্তিটা যেন সজীব হয়ে ওঠে তার চোখে। এই রাজার মতো লোকটি তার ঠাকুর্দাদের একজন ভাবতে গর্বে আর আনন্দে তার রোমাঞ্চ হয়।

'এঁরই রক্ত বইছে তোদের দেহে, বড় হয়ে তার মর্যাদা রাখতে হবে।'

ছোট ছেলে মণি রক্তের কথা শুনে ব'লে ওঠে, 'আজ পেরেক ঠুকতে আঙুলটা কেটে গেছলো বাবা, অনে—ক রক্ত পড়েছে।'

'চুপ মণি, বোকার মতো কথা বলিস নে।' দিব্যেন্দু ধমক দেয়।

মণি গুম হয়ে থাকে। তার সবচেয়ে রাগ হয় মূর্তিটার উপর। না-হয় হলোই বা একটা বড়ো পুতুল, তবু তা নিয়ে রোজ রোজ ঐ একই রকম কথা শুনতে তার ভালো লাগে না। তা ছাড়া অনেক কথাই তার বোধগম্য নয়, কেবল মারপিট বা দাঙ্গার গল্পগুলো সুরুতে খুব ভালোই লাগতো। মারপিটের কথা মনে হলেই ভাঙা তলোয়ারটায় মণির চোখ পড়ে—ভারি তো ভাঙা একটা তলোয়ার, আসুক না, তার হকিস্টিকের প্যাঁচ মেরে বুঝিয়ে দেবে মজাটা।

দুর্গানারায়ণ ভরসা রাখেন দিব্যেন্দুর উপর। ছেলেটার চালচলনে একটু গুরুত্ব আছে। মণির মতো পাড়ার আজেবাজে ছেলেপুলেদের সঙ্গে জুটে পড়বার ঝোঁক নেই। মণি হবে যেন একটু হাল্‌কা ধরনের—পারিবারিক মর্যাদা রাখতে হলে হয় তো বা রাখবে দিব্যেন্দুই। তাই দিবুর অভিজাত রক্তে মান-মর্যাদার ইতিহাসটা দুর্গানারায়ণ মিলিয়ে-মিশিয়ে এক ক'রে দিতে চান। ভবিষ্যতের অনেক চিত্রই তিনি আঁকেন দিব্যেন্দুকে নিয়ে, কিন্তু লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজতে গিয়ে দৃষ্টিটা যেন তাঁর ঝাপসা হয়ে আসে। তারই মধ্যে আশার কিছুটা আলো তিনি দেখতে পান যে-কোনো একটা বড় চাকুরিতে—দিবুর পড়াশোনার প্রতি দুর্গানারায়ণের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়।

দুর্গানারায়ণের সবটুকু মনোযোগ কেড়ে নেয় দিব্যেন্দু। সে-মনযোগ সার্থক ক'রে বছরের পর বছর পড়াশোনায় প্রথম স্থানও অধিকার করতে থাকে। মণির গতি সেখানে মন্থর, নামডাক তার খেলাধুলোয়।

উপস্থিতের তীব্র তাগিদে দূরবিগত তেমন আর স্পষ্ট হবার পথ পায় না। ক্রমে সন্ধ্যাকালীন মুখর ইতিহাস মূক হয়ে মিশে যায় মূর্তির গায়, ধীরে ধীরে ধূলা জমে তার সর্বাঙ্গে। তার সঙ্গতিহীন স্পর্ধিত অস্তিত্বটাও চোখে যেন সহজ হয়ে আসে।

মূর্তির ভাগ্য আবার প্রসন্ন হলো দিব্যেন্দু কলেজে ঢোকার পর। এবার সসম্মানে সে স্থান পেলো বাইরের ঘরে—পাঁচমেশালি পুরোনো চেয়ার জড়ো ক'রে দিব্যেন্দু যেটাকে

বসবার ঘর বানিয়েছে। মূর্তিটা শুধু যে অন্দর মহল থেকে মুক্তি পেলো তা নয়, রীতিমতো একটা মুক্তিস্নানও হলো তার। বালতি বালতি জল ঢেলে ঘষে-মেজে দিব্যেন্দু তাকে সাফ করেছে, শ্বেত মর্মরের অটুট শুভ্রতা এখন তকতক করছে তার সর্বাঙ্গে। মূর্তিটাকে মণি ডাকে 'গ্রেট গ্র্যানপা'। গ্রেট গ্র্যানপা-র উপর দাদার দরদ দে'খে সে হাসে।

দিব্যেন্দু তার সহপাঠী বন্ধুবান্ধব, এমন কি স্বল্প পরিচিতদের নিঃসংকোচে এখন আমন্ত্রণ করে তাদের বাড়ি আসতে। কোনো ধনী অভ্যাগতের উপস্থিতিতেও আসবাবের দৈন্য নিয়ে অস্বস্তি বোধ করে না। তা ছাড়া এমন সব প্রশ্নও ওঠে যার জবাব দিতে গিয়ে বিস্তর তথ্য উদ্‌ঘাটন করার সুযোগ দিব্যেন্দু পায়। কত বড় শিল্পী ডেকে কত হাজার টাকা ব্যয়ে এ মূর্তি গড়ানো হয়েছিলো, আর্টের কি আন্দাজ সমজদার ছিলো তাদের পরিবার, কেমন ছিলো সে দিনের হালচাল—ইত্যাদি কতো কি। ক্রমে আশৈশবের পরিচিত এ মূর্তিটির সঙ্গে কি এক নিগূঢ় সূত্রে দিব্যেন্দুর বন্ধন দিনের-পর-দিন নিবিড় হতে থাকে। এরই নির্দেশিত কোনো এক আদর্শে পৌঁছবার উদ্দেশ্যেই সে যেন বছরের-পর-বছর পরীক্ষার পাহাড়গুলো ডিঙিয়ে যায়।

মণি ম্যাট্রিকের কোঠাও পার হতে পারে নি। নিজেই যোগাড়যন্ত্র ক'রে ঢুকে পড়েছে একটা গ্যারাজে-এ—বলে, 'মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং শিখছি।' হাফসার্ট আর সর্ট চড়িয়ে

সশব্দ ব্যস্ততায় বেরিয়ে যায়, আবার তেমনি ক'রেই এসে ঢোকে। অজস্র ভুল ইংরেজিতে অনর্গল কথা ব'লে যায়—এমন কি দিব্যেন্দুরই সামনে, যে এবার ইংরেজিতে এম-এ দিচ্ছে—সংকোচের বালাই নেই। দুর্গানারায়ণের পুত্র দিব্যেন্দুনারায়ণ আর মণীন্দ্রনারায়ণ, কিন্তু মণি লিখতে আরম্ভ করেছে 'মণি বোস'। মণির এসব বর্বরোচিত ব্যবহারে দিব্যেন্দু একটা শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করে, ওর সংস্পর্শ সে সুসাবধানে বাঁচিয়ে চলে। নিষ্ফল জেনে দুর্গানারায়ণও কোনো প্রতিবাদ করেন না—মানুষ যে হবার নয় সে এমনি ক'রেই যায়।

দিব্যেন্দু পড়ছে, মণি ঘরে ঢুকে বললো, 'দিবুদা, তুমি রাজি হলেই হয়, বাবাকে বুঝিয়ে বলা কিছু কঠিন হবে না। প'ড়েই তো রয়েছে, গ্রেটগ্র্যানপা-র মূর্তিটা দাও না আমাকে। বেশ ভাল একজন পারচেজর পেয়েছি—আর্টফার্ট কলেকশ্যানের হ্যাবিট আছে। মোটা এ্যামাউন্ট পাওয়া যাবে। টাকাটা চাচ্ছি কেন জানো? পুরোনো কতকগুলো মোটার পার্টস বিক্রি হচ্ছে, কিনে রাখতে চাই। যুদ্ধ যে-রেটে এগিয়ে যাচ্ছে, একদিন হয়তো টু'হানড্রেড পার্সেণ্ট প্রফিট পেয়ে যাবো—তখন চাই কি নিজেই একটা ফার্ম স্টার্ট করতে পারবো। কি বলো—'

হাতের পাশা গড়িয়ে দিয়ে বাঞ্ছিত সংখ্যাটির আশায় খেলোয়াড় যেমন আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে, মণিও তেমনি টেবিলের উপর কনুই রেখে সাগ্রহে তাকালো দিব্যেন্দুর মুখের দিকে।

দিব্যেন্দু নিজেই বুঝিবা জ'মে পাথর ব'নে গেছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো 'যাও—এখান থেকে যাও—'

'ওয়েল'—মণি কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিলো। 'বই গিলে যা ঘরে আনবে, আই নো ছাট।' বলতে বলতে গট্‌মট্‌ শব্দে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল।

এ পর্যন্তও বুঝিবা মাত্রার গা ঘেঁষেই চলছিলো তাই প্রতিবাদটা তেমন তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু মণি যেদিন হাতের চামড়ায় উল্কি দিয়ে লতাপাতা কাটা নাম লিখিয়ে এলো, সেদিন যেন সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে গেল। বাড়ির আবহাওয়াটাই হয়ে গেল থম্‌থমে। দুর্গানারায়ণ ঘরে পাইচারি করতে লাগলেন, দিব্যেন্দুর মুখে রা নেই। কাজটা কতখানি রুচিবহির্ভূত মণির মা সেটা জানেন না বলেই হয়ত এতটা মর্মাহত হন নি।

আভিজাত্যের স্বভাবসিদ্ধ সংযমে উত্তেজনাকে দুর্গানারায়ণ আয়ত্তে আনেন। কি হবে এখন প্রতিবাদ জানিয়ে, যত দিন মণি বাঁচবে তার হাতেই লেখা থাকবে তার রুচির পরিচয়—সেই সঙ্গে জড়িত থাকবে বসু-বংশের নাম। রক্তের এই অধোগতি তিনি কি ক'রেই বা রুখতে পারেন!

দিব্যেন্দু সারাটা দিন চুপ থেকে সন্ধ্যায় পিতাকে জানিয়ে দেয়, মণির সঙ্গে সম্পর্ক তার এখানেই শেষ, ভবিষ্যতে ভাই ব'লে স্বীকার তাকে করবে না। সে-রাত্রে পড়ায় তার মন বসে না,

খোলা বই সামনে রেখে পলকহীন চোখে দিব্যেন্দু তাকিয়ে থাকে শুভ্র শ্বেতমর্মরের মূর্তিটার দিকে।

জাপানী আক্রমণে বর্মা বিধ্বস্ত—সমগ্র কলকাতা জুড়ে পালাই-পালাই। দুর্গানারায়ণের আপিস উঠে গেল লক্ষ্ণৌ। মেয়েদের সর্বাগ্রে সরানো দরকার, দুর্গানারায়ণের সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌ যাত্রাই স্থির হলো। দিবু আর মণির কলকাতার বাইরে যাওয়া চলবে না—মণির অনেক কাজ, দিবুর চলছে কাজের চেষ্টা।

বাবা মা চ'লে গেলেন। ব্যয়-সংকোচের জন্য বাড়িটা ছাড়তে হবে, অতএব মেস ছাড়া গত্যন্তর নেই। মণি উল্লসিত কিন্তু দিব্যেন্দুর অসহায় বোধের অন্ত থাকে না। অসুবিধার কথা যদি বা ভুলতে পারে, এতবড়ো অবনতিকে মেনে নিতে কিছুতেই তার মন সরে না। 'মেসের লোক' কথাটা যে গালিরই সামিল।

মণি জিজ্ঞেস করলো, 'মূর্তিটার কি করবে, এটা দিই পাঠিয়ে ছোট মামার ওখানে, ওরা ত বাড়িটা রেখেই যাচ্ছেন।'

নানা দুর্ভাবনায় মূর্তির কথাটা দিব্যেন্দু যেন ভুলেই গিয়েছিল, মনে পড়তেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। গা ঝাড়া দিয়ে সে উঠে বসে। কিন্তু গা ঝাড়া দিলেই তা আর সক্রিয় হয়ে ওঠে না, শেষ পর্যন্ত অস্বীকৃত ভ্রাতৃত্বের কাছেই আবেদন জানাতে হয়—বলে, 'মূর্তি নিয়ে তোর ভাবতে হবে না, ওটা আমার সঙ্গে যাবে। তুই অল্প খরচের একটা পরিচ্ছন্ন মেস ভাখ আমার জন্যে।'

'সঙ্গে যাবে—মেসে!' অবাক চোখে মণি প্রশ্ন করলো।

'তুমি কি খেপলে নাকি—ম্যাড—ম্যাড—'উচ্চহাস্যে ঘরদোর কাঁপিয়ে মণি বেরিয়ে গেল।

মণির হাসি দিব্যেন্দুকে স্পর্শ করে না। মেস-এ উঠছে ব'লে মূল্যবান জিনিস ফে'লে যেতে হবে নাকি! বারোভূতের সঙ্গে হরেদরে এক হয়ে যেতে দেয় না এমন জিনিস সঙ্গে নেওয়াই তো ভালো। আনাড়ি দৃষ্টিতে যেখানে মূল্যবিচার, আদত হীরের অঙ্গে সেখানে মোটা অঙ্কের টিকিটটা আঁটা থাকার দরকার আছে।

মেস ঠিক করা থেকে ঠেলা যোগাড় সবই করতে হয় মণির। আটটা কুলি নেওয়া হলো মূর্তিটাকে মেসের উপরতলায় তুলতে। মেসের মেম্বররা সব জড়ো হয়ে দেখে, কেউ বা উপদেশ দেয় কি ভাবে তুলতে সুবিধে হবে। সিঁড়ি বেয়ে উঠানোর সময় পিছন থেকে মণি হুঁসিয়ারির হাঁক ছাড়ে। অকস্মাৎ নিচের দিককার একটা কুলির পা গেল কস্‌কে, অন্য কুলিরাও পারলো না তার ঝোঁক সামলাতে, ধপাস ক'রে প'ড়ে মূর্তিটা তিনখণ্ড হয়ে গেল।

মেম্বররা সকলে হায়-হায় ক'রে উঠলো। মণির ক্রুদ্ধকণ্ঠ-নিঃসৃত আওয়াজ শোনা গেল—'উল্লুক তোম্‌লোগ্‌কো শিরবি হাম তোড় দেগা।'

কুলিগুলো কপাল চাপ্‌ড়ে আপসোস জানাতে লাগলো—এমন একটা আচ্ছা চিজ আজ তাদের হাতে নষ্ট হয়ে গেল।

কার দোষ, কেমন ক'রে হলো, কি করলে হতো না, এসবের মিলিত হট্টগোলের মধ্যে একমাত্র স্তব্ধ হয়ে রইলো দিব্যেন্দু।

মণি বললো, 'যাকগে, ব্যাটাদের কেটে ফেললেও তো আর এর দাম উঠবে না—আঃ জিনিসটা ছিল কিন্তু ভারি সুন্দর, বিক্রি করলে কতকগুলো টাকা পাওয়া যেতো!' মোটার-পার্টস্‌গুলো সখেদে মণির স্মরণ হয়। 'এখন কি করবে বলো তো? ওপরের টুকরোটা রাখতে পারো। পাগড়ি আর নাকের খানিকটা ভেঙেছে, নয় তো মোটামুটি ঠিকই আছে।'

'না সব কটা টুকরোই থাকবে।' কথাকটি ব'লে দিব্যেন্দু গিয়ে তার ঘরে ঢুকলো।

জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে দিব্যেন্দুকে 'চিয়ার আপ' ক'রে মণি বিদায় নিলো।

দিব্যেন্দু তেমনি স্তব্ধ হয়েই ব'সে রইলো।

তার মনে হতে থাকে, এখন থেকে সাধারণের চোখে তার পরিচয়—একজন বেকার, মেস-এ থেকে চাকরির চেষ্টা করছে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।



তামাসা

ডমরু বেজে ওঠে। ডিমি ডিমি ডিমি টর্‌রুম টর্‌রুম—

দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে নয়, পাগলা সাধুর হাতে। তার সঙ্গে নাচও চলে, কিন্তু সে-নাচ প্রলয়ের কোলে নটরাজের নৃত্য নয়, কলকাতার ফুটপাথে গঙ্গারামের নৃত্য—গঙ্গারাম একটা বানর।

পাগলা সাধু কে, কি তার নাম, কি তার জাতি—কেউ জানে না। জানার দরকারও হয় না। জীবনের কোনো জটিলতায় যারা নেই তাদের নাম বা জাতের প্রয়োজনটা কি! যেমন ও-সবের দরকার হয় না ভিকিরিদের, শুধু কানা-খোঁড়া-বেটা-বেটিতেই চ'লে যায়। পাগলা সাধু নামটাও তেমনি গুণবাচক। চালচলন পাগলের মতো, পোষাকের রং গেরুয়া, তাই যার ডাকতে হয় ডাকে পাগলাসাধু বা সাধু। গায়ে তার বিভিন্ন বর্ণের তালিযুক্ত কাঁথার আলখাল্লা, কাঁধে থাকে সেই রকমই একটা কাঁথার তৈরি ঝুলি। ঝুলিটাকে একপাশে রেখে ব'সে গেছে ফুটপাথে। ঘিরে দাঁড়িয়েছে একপাল ছেলেপুলে,

এদিক-ওদিকের বারান্দায় মেয়েরাও ঝুঁকে রয়েছে। সাধু হাঁক ছাড়ে—আরে গঙ্গারাম, তুম্‌হি সাধি কোরবে? গঙ্গারাম মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। দর্শকরা হেসে ওঠে। সাধু ডেকে বলে—হা রে বুড্‌হি, তোম্ রাজি? ছোট বানরটা তার কানের কাছে মুখ তুলে ঠোঁট নাড়ে। সাধু ব'লে ওঠে—গহনা, শাড়ি আওর গাড়ি দেও তো বুড়্‌হি রাজী। গঙ্গারাম গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে। ভঙ্গি দেখে আবার সবাই হাসে। ভালুকটা আচমকা হি হি ক'রে কাঁপতে থাকে, সাধু তার পিঠ চাপড়ে বলে—ফিকির না করো ভোম্বলদাস, বাটি-বাটি মধু মিলবে রে বেটা, বাটি-বাটি মধু—

আকাশ জুড়ে উড়োজাহাজের গোঙানি, ছেলেপুলেরা ফিরেও তাকায় না; মাটির ওপর চলেছে স্থূলোদর ভাল্লুক আর বানরের নাচ, হাঁ ক'রে তা-ই দেখে—সঙ্গে বাজে ডমরু ডিমি ডিমি ডিমি টর্‌রুম টর্‌রুম।

হঠাৎ রব উঠলো 'সাইরেন' 'সাইরেন'। যে-যার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো। পথচারীরা আশ্রয় নিলো পাকা পর্দার আড়ালে। সাধুকেও পাত্‌তাড়ি গোটাতে হলো—নাচের মজুরিটা হয় তো আর মিললো না। কতক্ষণ চলবে কে জানে। সেও গিয়ে বসলো একটা পাকা পর্দার আড়ালে, তার গা ঘেঁষে রইলো ভোম্বলদাস গঙ্গারাম আর বুড়ি।

চারদিকে দমাদম্ জানালা-কপাট বন্ধ করার শব্দ। পথে এ-আর-পির লোকের ধম্‌কানি। ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

আছে নোংরা একটা কাঠের ঠেলাগাড়ি, মধ্যে একটা গলিত কুষ্ঠী—পয়সাহীন রাজ্যে পয়সার ভিকিরী। এ-আর-পির লোক হুম্‌কি ছাড়ে, 'এই, তোমরা আদ্‌মি কিধার ?' কিধার ও কি জানে, বসিয়ে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে। লোকটাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানোর জন্তে কর্মচারীটি ছুটোছুটি করতে থাকে। গাড়িটা ছোঁবে কে, কেউ রাজি হয় না। দেয়ালের পেছনে জমায়েত হয়েছে যারা, লোকটির কাণ্ড দেখে তারা হাসে। নিছক মাতব্বরি, না হয় এ নিয়ে এতটা ব্যস্ত হবার কোনোই যে কারণ থাকতে পারে না, সবাই বোঝে সেটা—বোমা ওর ঘাড়ে পড়লে ওর বা পৃথিবীর ক্ষতিটা কি !

শেষ পর্যন্ত কর্মচারীটি নিজেই একটা ছাতা নিয়ে তার বাঁকা দিকটার সাহায্যে গাড়িটাকে টানতে লাগলো। সাধু হা হা ক'রে হেসে উঠলো উলটো দিকের দেয়ালের পাশ থেকে। ডেকে বললো, 'দেখ্ গঙ্গারাম, মজা দেখ বেটা।' গঙ্গারাম সত্যি সত্যিই গলা বাড়িয়ে দেয়, সঙ্গে বুড়িও। ভোম্বলদাসের কোনো কিছুতেই তেমন উৎসাহ নেই, সেটা হি হি ক'রে কাঁপছে, এই মাত্র আবার তার জ্বর উঠলো।

যে দেয়ালের পিছনে গাড়িটাকে ঢোকানো হলো সেখানটা দেখতে দেখতে প্রায় খালি হ'য়ে গেল। সাধু আবার হেসে উঠলো, এবার খুশির ঝোঁকে সে ডমরুটাকেই বাজিয়ে দিলো বার দুই—টর্‌রুম টর্‌রুম। কে একজন ধমকে উঠলো, 'এই কেয়া করতা ?' সাধু তার দিকে তাকায়, ঝাঁকড়া চুল আর

দাঁড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন মুখের উপর জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ। সে চোখের দৃষ্টি কেবল তীক্ষ্ণই নয়, বেশ যেন গভীর। ধমক যে দিয়েছে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সাধু ব'সে কাশে—গাঁজা-খেকো গলার কাশি। চেয়ে চেয়ে দেখে লোকগুলোকে—কি চমৎকার, মুহূর্তে কেমন কাপড়-পাতলুন-শাড়ি-নেংটি-গেরুয়া-টুপি-ধামা মিলে-মিশে একই আশ্রয়ে এসে মাথা গুঁজেছে। মৃত্যুভয় যেন মানুষ ক'রে দিলো মানুষগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য! একটি মেয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে বুকে বই চেপে, তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সাধু। এমনি একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে—তার বোন শুভা।

ভদ্রমেয়ের উপর বর্বর লোকের এই চোখখোলা দৃষ্টি একটি যুবকের সহ্য হয় না, মেয়েটিকে সে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়।

সাধু একটি বিড়ি ধরিয়ে ভোম্বলের গায় হেলান দিয়ে চোখ বুজলো। নানা কথা কানে আসে। ঐ কুষ্ঠী ভিকিরীটার সূত্র ধ'রেই আলোচনা চলছে। ভিক্ষুকদের নিয়েও ভাববার নাকি সময় এসেছে, তাম্রখণ্ডের অভাবে তারাই বিপদে পড়েছে সবচেয়ে বেশি—ইত্যাদি। নামটা সাধু ঠিক মতো শুনতে পায়নি কিন্তু পরের কথাটা কানে আসতেই সোজা হয়ে বসলো। একজন বলছে বালিগঞ্জে নাকি প্রত্যেক ভিক্ষুককে এক টাকা ক'রে দান করবে—পয়সার অভাবে ওরা যে-আন্দাজ কষ্টে

পড়েছে তার কিছুটা অন্তত লাঘব করার চেষ্টা। সাধু মনে মনে স্থির করে সেও যাবে গঙ্গারামদের রেখে। একটা টাকা —বেশ কিছুদিনের গাঁজার খরচটা ট্যাঁকে আসবে। কে একজন বলে, 'সে যে অজস্র টাকার দরকার মশাই—লোকটার দিল আছে বলতে হবে।' আর একজন ব'লে ওঠে, 'আরে রাখুন মশাই দিল-ফিল—ওসব মন্ত্রী হবার ফিকির-ফন্দি। খানিকটা পপুলারিটি দরকার, তাই—পলিটিক্স্ মশাই পলিটিক্স্।

পলিটিক্স্—কথাটা সাধুর মনটাকে পরিবেশ থেকে এক টানে ছিনিয়ে নিয়ে যায় পনেরো বছর পিছনে। উপস্থিত কথাবার্তার একটা শব্দও আর কানে পৌঁছয় না। এক এক ক'রে মনে পড়ে সব বিপর্যয়কারী ঘটনাগুলি। সেই তাদের দল, তাদের দেবেশদা—দেবেশদার কথা স্মরণ করতেই মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। ডাকাতি করার প্রশ্ন যেদিন প্রথম উঠলো, পরের অর্থ ছিনিয়ে আনায় তার নিজের সমর্থন ছিলো না, কিন্তু দেবেশ হাজরার আদেশই যে-কোনো কাজকে উচিত ব'লে মেনে নেবার পক্ষে ছিলো যথেষ্ট। শান্ত সেই গুরু কণ্ঠের একটা কথা আজও স্পষ্ট স্মরণ আছে, 'অর্থ সম্পদ যেখানেই জ'মে উঠে থাক তা দেশের, দেশের প্রয়োজনে তা না পাই তো ছিনিয়ে আনতে হবে।' তারপর রাতের পর রাত মুখোশ-আঁটা মুখের নির্মম দাবি—সিন্ধুকের চাবি চাই।

অলংকার অর্থ সবই এনে ঢেলে দেওয়া হতো মন্মথ সমাদ্দারের হাতে। সন্দেহের স্পর্শ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সমাদ্দারকে বাইরের

কোনো কাজেই টান। হতো না। ধীরস্থির লোকটি দিনরাত ব'সে থাকতো বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে। সাহস আর ব্যক্তিত্বে দেবেশ হাজরার তুল্য না হলেও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় আর পাণ্ডিত্যে বলতে গেলে সে-ই ছিলো সেরা। নিজে দরিদ্র, তাই দারিদ্র্যের উপর ছিলো তার অপরিসীম ঘৃণা।

অবশেষে সামাজিক জীবনের অবসানকারী অন্ধকার রাত্রির রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলি ধীরে ধীরে তার মনের সামনে ভেসে ওঠে। সিলিমপুরের উঁচু-নিচু মাঠের উপর দিয়ে সে দৌড়চ্ছে—কাঁধে বিভূতি। বিভূতির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার গা বেয়ে। চৌধুরী বাড়ির দেউড়ি থেকে যে লোকটা বিভূতির গায়ে বর্শা ছুঁড়েছে তাকেও সে জ্যান্ত রেখে আসেনি। টান দিয়ে বর্শাটা খুলবার সময়ই সে টের পেয়েছিলো আঘাত গুরুতর। তারপর সেই সামান্য দু-চারটি কথা। বিভূতি বলছে, 'ঐ লোকটাকে না মারলেই হতো—এ্যাসিডের শিশি কি—' সে হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিয়েছে, 'হ্যাঁ আছে আমার সঙ্গে একটা'। 'আমার মুখটা ঝল্‌সে দিয়ে তুই পালা অমূল্য, আমি বাঁচবো না।' বিভূতির মাথা তার ঘাড়ের উপর এলিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিভূতির কথা-মতো কাজই তাকে করতে হয়েছে কিন্তু তবু পালাতে সে পারলো না, ধরা তাকে পড়তে হলো। তার ধারণা ছিলো, সে-ই শুধু আটক পড়েছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে-ভুল তার ভাঙলো। যে ক'জন গিয়েছিলো, সিলিমপুরের সীমানা কেউ পার হতে পারেনি, সবাই ধরা পড়েছে—পুলিস

নাকি আগে থাকতেই খবর পেয়েছিল। কি ক'রে পেলো, কে দিলো তা নিয়ে অনেক গবেষণাই তাদের মধ্যে হয়েছে কিন্তু সে আলোচনায় যোগ দেয়নি শুধু দেবেশ হাজরা। মোটা মোটা সংখ্যার বৎসরের রায় ঘাড়ে নিয়ে কোর্ট থেকে বেরুবার সময় সে শুধু বলেছিলো, 'তোর তা লম্বা পাড়ি অমূল্য, আর ফিরবি কিনা কে জানে—নিশ্চিন্ত থাকিস, মন্মথর বিচারটা আমি বেরিয়েই করবো।'

দেশ ছেড়ে কোথায় কোন্ দ্বীপে গিয়ে পচে মরতে হবে ভাবতেও অমূল্যর মাথা যেন খারাপ হয়ে যায়। আগ্রহের আতিশয্যে সে অসাধ্য-সাধন করলো—জেল থেকে সে পালালো। তারপর একাদিক্রমে তিন বৎসর ইঁদুরের মতো গোপনচারী জঘন্য জীবন। সে হাঁপিয়ে ওঠলো। অবশেষে একদিন সমাজের বাইরে পার্বত্যসন্ন্যাসের মুক্ত হাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে সে বাঁচলো। ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসতে লাগলো গত জীবনের স্মৃতিগুলি।

হরিদ্বারে বন্ধুত্ব হলো এক তামাসাওয়ালার সঙ্গে। লোকটা বেদম গাঁজাখোর, তার কাছে দীক্ষিত হলো গাঁজায়। তখন সে সন্ন্যাসী বেশে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। নেশার মাথায় লোকটা বেশ ভালো ভালো কথা বলতো, নিজস্ব না শোনা কথা বোঝা যেতো না। প্রায়ই বলতো, 'ভিখ্ নিবিও না দিবিও না'—দয়া নাকি দাবানো—মানুষদের হাতে রাখার এক মহৎ যন্তর। তারই কাছে থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই তিনটি

জীব, যা নিয়ে এখনও সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলা দেশে এসে ঢুকেছে দীর্ঘ পনের বছর পর। আজ আর তেমন ক'রে ভাবতেও পারে না যে একদিন সে এদেরই একজন ছিলো। সুবেশী একটি বাঙালী ছেলেকে সম্বোধন করতে গিয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'বাবুজী আপ' বা 'বাবু আপনি।' তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করার সহজতা মরেছে, সমাজ এবং শ্রেণী-বহির্ভূত রাস্তার ভিকিরীগুলোকেই একমাত্র মনে করতে পারে আপনার জন।

গঙ্গারামের টানাটানিতে তার চিন্তার নেশা ছুটে গেল। বিপদমুক্তির ধ্বনি পেয়ে লোকজন কখন স'রে গেছে সে জানতে পারে নি। সাধু উঠে দাঁড়ালো। ডমরুটা ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে বললো, 'চল্ গঙ্গারাম ঘর চল্'—ঘর বলতে পার্ক শেড-এর আস্তানা।

দানের খবরটা সত্য, দেখতে দেখতে সমস্ত শহর ছেয়ে গেছে—মন্মথ সমাদ্দার ছেলের অন্নপ্রাশনে কলকাতার ভিকিরী-দের প্রত্যেককে এক টাকা ক'রে দান করবেন। চারদিকে ধন্য ধন্য। ভিকিরীরা শুভ দিনটির আশায় দিন গুণছে—দর্শকরাও। নামটা কানে ঢোকা মাত্র সাধুর মাথায় গুরু আঘাতের একটা অনুভূতি জাগে। গাঁজায় খুব কড়া রকম একটা দম দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে—লোকটাকে দেখতে হবে সে-ই কি না।

বাড়ির খোঁজ নিতে অসুবিধা নেই, ভিকিরী মাত্রেই আজ

তার বাড়ি চিনতে উন্মুখ। সাধু ঘুরে বেড়ায় দেউড়ির আশে-পাশে। বিরাট একটা গাড়ি বেরিয়ে গেলো দেউড়ি দিয়ে, ভেতরে যে লোকটি বসে আছে তাকে দেখা মাত্র সাধুর চোখ ছুটো জলে উঠলো আগুনের ফুল্‌কির মতো।

সমাদ্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ একবার করতেই হবে কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব, তার পথ খুঁজে পায় না সাধু। সাক্ষাৎ তো দূরের কথা সামনের আঙিনায় প্রবেশ করাই যে অসম্ভব। তার সঙ্গে কোনো কালে এর পরিচয় ছিলো বললে চাকর-বাকর হেসেই উড়িয়ে দেবে সন্দেহ নেই—মানুষ হয়ে জন্মানোটাই যে-কোনো মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার কারণ হতে পারে না।

নিষ্প্রদীপ নগরীর অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে, কৃষ্ণ-সায়রে একমুঠো হল্‌দে গুড়োর মতো মাঝে মাঝে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে আছে লাইটপোস্টের ক্ষীণ আলো। সাধু গিয়ে দাঁড়ালো সমাদ্দারের বাড়ির সামনে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো বিরাট বাড়িটার দিকে। সামনে পিছনে অনেকটা ক'রে জমি। সামনের বাগানটা নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, পেছনে অনেকটা উঁচু দেয়াল, ভেতর দেখা যায় না। বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে, জানালা দিয়ে দেখা যায় সমাদ্দার ব'সে আছে টেবিলের উপর ঝুঁকে—একা। সাধু দেয়াল টপ্‌কে আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল।

'কে—কে তুমি, কি চাই?' ভীত ও বিস্মিত হয়ে সমাদ্দার ব'লে উঠলো।

'আমি অমূল্য—অমূল্য গুপ্ত—'

মন্মথ সমাদ্দার মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকায়, তারপর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে, এদিক ওদিক তাকিয়ে দু-একটা জানালার পরদাও টেনে দেয়।

'—হ্যাঁ বসো।'

বসতে বাধলো অমূল্যর। চেয়ারে বসা শুধু অভ্যাস নয়, ধারণারও বাইরে চ'লে গেছে—তার উপর এই গদি-আঁটা কৌচে। দু-একবার দ্বিধার পর অমূল্য বসলো।

'হুঁ—তারপর—হঠাৎ এতকাল পরে কোথা থেকে, কি মনে করে—'

'আমাদের সেই টাকাগুলোর কি করলে জানতে এলাম।' কোন ভূমিকা না ক'রে অনেকটা যেন জোর ক'রেই কথাটা অমূল্য ব'লে ফেললো।

'অ—টাকার হিসেব চাইতে এসেছ, যদি না দিই ?'

'দিতে আপনি বাধ্য। আমরা জীবন দিয়ে এ টাকা সংগ্রহ করেছিলাম আপনার বিলাসের জন্যে নয়—' বিভূতির মৃত দেহটা যেন কাঁধের উপর অনুভব করে অমূল্য। 'এ অপরাধের শাস্তি আপনার পাওনা আছে।' স্থানকাল ভুলে উত্তেজিত কণ্ঠে অমূল্য ব'লে ওঠে। পনেরো বছরের পুঞ্জীভূত গ্লানির স্তূপ ভেদ ক'রে বিগত দিনের বিপ্লবী মনটা হঠাৎ যেন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠলো আজ।

ফোন-এর রিসিভর-এ হাত রেখে মন্মথ সমাদ্দার ধীরে ধীরে বলে, 'তোমার মাথার অবস্থা সুস্থ ব'লে মনে হচ্ছে না অমূল্য—ভুলে গেছ বোধ হয় তোমার জীবন হালকা সুতোয় ঝুলছে—আর কিছু তোমার বলবার আছে?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমূল্যর উপর নজর রাখে মন্মথ সমাদ্দার।

বাস্তব বুদ্ধি ফিরে এল অমূল্যর। গলার স্বরটা নরম ক'রে বললো, 'কর্তব্য মনে করেছি খোঁজ নিতে এলাম, ইচ্ছে হয় ধরিয়ে দিতে পারেন, না দেন—দয়া, স্মরণ রাখবো—হ্যাঁ, দেবেশদার কোনো খোঁজ রাখেন?'

'দেবেশ জেল থেকে বেরিয়েই আমার সঙ্গে দেখা করেছিলো, তাকে আমারই একটা বিজনেস্ কন্‌সার্ন-এ ম্যানেজার ক'রে দিয়েছি—মাইনে তিনশো। তোমার জন্যে ওরকম কিছু করার যে উপায় নেই, না হয় করতাম নিশ্চয়ই—চাও তো টাকা দিতে পারি কিছু।'

দেবেশ হাজরার খবর শুনে অমূল্য স্তব্ধ হয়ে ছিলো, শেষের কথাটা কানে আসতেই বললো, 'না, টাকার আমার দরকার নেই—আর নিতেই যদি হয় সেদিন এসে হাত পেতে নেবো, আপনি যেদিন দান করবেন।' একটু চুপ থেকে বললো, '—আমার একটা অনুরোধ রাখুন, আপনার এই দানটা বন্ধ করুন।'

'আবার উপদেশ দিচ্ছ অমূল্য—যাক্, দান বন্ধ হবে না, কিন্তু কেন, এ সৎ ব্যয়ে তোমার আপত্তি কিসের?'

'সৎ ব্যয়! এ তো নিছক ইয়ার্কি—উপহাস। এ দানে

আপনার স্বার্থসিদ্ধি হ'তে পারে, ওদের লাভ কতটুকু! ওদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই মন্মথবাবু—ওদের মরতে দিন। ভিক্ষা-বৃত্তিটা মরে এমন কোনো কাজে খরচ করুন টাকাটা, তবু কিছুটা সান্ত্বনা পাবো।'

'তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। ওসব কথা আমার কাছেই শিখেছিলে—এখনকার দিনের নতুন কথাগুলো জান না নিশ্চয়ই—আচ্ছা—' মন্মথ সমাদ্দার উঠে দাঁড়ালো।

বাড়ির আঙিনা পার হয়েই অমূল্য চট্ ক'রে মিশে পড়ে অন্ধকারে—লোকটাকে বিশ্বাস নেই। মনে মনে সে স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়েই বেরিয়ে এসেছে—ওকে দণ্ড দেওয়াই তার জীবনের শেষ কর্তব্য। দেবেশ হাজরা বিকিয়ে গেছে, কিন্তু সে আছে, আত্মোন্নতির পাথেয় এই দানের মহিমা তাকে সে অর্জন করতে দেবে না—এটা বন্ধ করতেই হবে—এমন কি, তার চেয়েও বেশি কিছু—

কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব?

বাড়ির পিছনের ময়দানে বিরাট হোগলার ছাউনি বাঁধা হয়েছে, তাতে রঙিন কাপড়ের গেট, চার পাশে রঙিন কাপড়ের সজ্জা। সমস্তটা জুড়ে গেছে অসংখ্য নিমন্ত্রিতের ভিড়। দুর্লভ পেট্রোল পেটে নিয়ে রাস্তার দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সব মোটর গাড়ি। নিমন্ত্রিতদের অনেকেই রয়ে গেছে দান দেখে ফিরবে ব'লে।

সকাল থেকেই শতসহস্র ভিক্ষুক এসে জমায়েত হয়েছে বাড়ির চারপাশে। অমূল্যও এসেছে। তার গেরুয়া আলখাল্লা গায়ে নয়, ছেড়া নেংটি প'রে—লাঠির মতো ক'রে ধরা হাতে লম্বা একটা লোহার শিক। একপাশে দাঁড়িয়ে সে সমাজের এই জ্যান্ত আবর্জনাগুলোর কাণ্ড ও কলহ দেখছিলো। এক-একদল আসছে, মানুষ তো নয় কর্পোরেশনের এক-এক গাড়ি আবর্জনা। জাত-ধর্ম রীতিনীতি নারী-পুরুষ রোগ-খাদ্য—সব কিছুর বাছ-বিচারহীন এক অদ্ভুত জীবন! এদের এভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করার নাম দয়া। ধনীর সমাজ-মুখে এরা যেন গোঁপ দাঁড়ি—না গজালে মাকুন্দো, তার বৈশিষ্ট্যে আঘাত লাগে; গজাতেও হবে, কাটাও পড়বে।

ভিকিরীদের ডাক পড়ে। শত শত একসঙ্গে ধাওয়া করে ময়দানের দিকে। হাতে ছোঁওয়া অসম্ভব—স্বেচ্ছাসেবকেরা লাঠির সাহায্যে লোকগুলিকে ঢুকিয়ে দেয় ময়দানে। কয়েক সহস্র ঢুকবার পর স্থানাভাবে আরও অনেকে বাইরে অপেক্ষা করে দ্বিতীয় দফার জন্যে।

গেট বন্ধ হয়ে গেলো—অমূল্য ঢুকতে পারলো না।

গোময় পিণ্ডের মতো মাঠময় গঁদিয়ে ব'সে গেছে ভিকিরী-গুলি। একপাশে একটা মঞ্চের উপরে মন্মথ সমাদ্দার বসেছে হাজার হাজার টাকা নিয়ে। একজন ক'রে তার হাত থেকে একটি টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাবে উল্‌টো দিকের গেট দিয়ে। গেটের কাছে মস্ত একটা বালতি ভরা পাকা রং, বেরুবার সময় হাতটা তাতে

ডুবিয়ে দেয়—দুবার ঢুকে দুটো টাকা না নিয়ে যায়। এ ব্যবস্থা পরে করা হয়েছে—একবারে স্থান সংকুলান হয়নি ব'লে।

গেটের ফাঁক দিয়ে অমূল্য তাকিয়ে আছে—অমানুষিক হিংস্রতায় জ্বলছে তার চোখ দুটো। হঠাৎ তার মুখচোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—মনের তলা থেকে কে যেন চুপি চুপি বলে—আগুন! কিন্তু কেবল তো মন্মথ সমাদ্দার নয় আরও যে রয়েছে অজস্র নরনারী। সঙ্গে-সঙ্গে যুক্তি ওঠে—মরণ কোথায়? সে-তো মুক্তি—

আগুন—আগুন—দীন আর দয়াল, দাতা আর দরিদ্র উভয়কে ঘিরে দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে থাকে দিব্য পাবক। ধোঁয়ার সঙ্গে ঊর্ধ্বে ওঠে অসংখ্য ভিকিরীর প্রাণের আকুতি। ক্রমে আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই ওঠে বেশি। নগ্নদেহীর গায়ে আগুন তেমন জোর ধরে না, যেমন জোর ধরেছিলো সেদিন কলকাতার মধ্যবিত্তদের গায়ে, যেমন সোল্লাসে জ্বলেছিলো সে বোস্টন প্রমোদগৃহের বিলাসীদের অঙ্গে।

আসে ফায়ার-ব্রিগেড। হোজ পাইপের মুখ থেকে ছিটকে গিয়ে লাফিয়ে পড়েন গঙ্গাদেবী তার সহস্র সন্তানের অর্ধদগ্ধ মৃতদেহে।

পরের দিন সম্পাদকদের কলম কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে মহাত্মা মন্মথ সমাদ্দারের শোক-গাথায়—সঙ্গে আরও দু-দশ-জনের। কিন্তু নাম-গোত্রহীন শতসহস্র নরনারীর কথায় এসে

থম্‌কে কলম থেমে পড়ে—কি কারণে শোক, সমাজের চিকিৎসা-বহির্ভূত গলিত অঙ্গের খানিকটা পচে গ'লে না প'ড়ে হঠাৎ কেন কাটা পড়লো—তাই!

এতগুলো মানুষের এমন অমানুষিক পদ্ধতিতে মরবার কথা নিয়েই লেখা হলো দু-চার লাইন—অবশেষে আত্মার শান্তি কামনা।

রাস্তায় কাগজওয়ালা হাঁকে 'ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে মহাত্মার জীবনান্ত।' থেকে থেকে আকাশ জুড়ে নামে উড়ো জাহাজের গোঙানি—সমাদ্দারের বাড়ির পথ দিয়ে চলতে চলতে সাধু চেঁচিয়ে ওঠে, 'ভোম্বল নাচে, বুড়ি নাচে, নাচে গঙ্গারাম—' ডিমি ডিমি ডিমি টর্‌রুম টর্‌রুম!

ঝাপসা চোখ

নগর-সভ্যতার এক অনিবার্য ব্যবস্থা—এই মেস-এর জীবন।

এ জীবনের সঙ্গে মোটেই পরিচয় ছিল না, লড়াইয়ের কল্যাণে সেটা হয়ে গেল। ইভ্যাকুয়েশনের ধাক্কায় পারিবারিক জীবন দ্বিখণ্ডিত হলো। পরিহার্য নাগরিক হিসেবে স্ত্রী চিন্তাকুল চিত্ত নিয়ে চ'লে গেলেন পিত্রালয়ে—অপরিহার্য নাগরিক আমি, বোমভীতি ঘাড়ে নিয়ে প'ড়ে রইলাম কলকাতায়।

ঘাড় থাকলেই তার জন্যে একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন—খুঁজে পেতে একটা মেস বার করা গেল। এ মাসে যিনি ম্যানেজার তারই ঘরে একটা সিট খালি। চারটে ঘর, আটটা সিট—আমিই অষ্টম ব্যক্তি।

ভিড় বাড়বার সম্ভাবনা নেই জেনে উৎসাহ বোধ করলাম।

ম্যানেজার ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কেউ গান গায় কি—সিনেমার গানটান—'

প্রশ্নের তাৎপর্যটা তিনি বুঝেছেন তারই অভিব্যক্তি হিসেবে মৃদু একটু হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। রাসভারী গলায়

বললেন, 'তা হলে কি আর আমিই এখানে থাকতাম, সব সময় পড়াশুনো নিয়ে থাকতে হয়।'

পড়াশুনো তিনি করেন তার প্রমাণস্বরূপ কতক মোটা-বইও রয়েছে টেবিলের ওপর। এরই সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হবে—একবার লক্ষ্য করে দেখে নিলাম। কালো ছোটোখাটো লোকটি, চোখে পুরু পেবল্‌স্‌-এর চশমা। দৃষ্টির ক্ষীণতার জন্যেই হয়তো ভ্রূ-কুঁচকে এমন তীক্ষ্ণভাবে তাকান প্রথমটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ব'লে ভুল হয়। চুলগুলো পেছন দিকে ঠেলে দেন কিন্তু তেমন নমনীয় নয় ব'লে ফেটে দু'তিন ভাগে ভেঙে পড়ে। কথাবার্তায় বেশ একটু একরোখা এবং অতিরিক্ত আত্মশ্রদ্ধা-সম্পন্ন বলেই মনে হয়। পরিচয় বিনিময়ে জানা গেল নাম যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোনো এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

যোগেশবাবু স্কুলের জন্যে তৈরি হলেন—জামাটা গায়ে চড়িয়ে বললেন, 'দু'একটা দিন একটু অসুবিধে হবে, গত কাল চাকরটা ভেগেছে। এমন পাজি এই সারভেন্ট ক্লাস আর বলবেন না—স্টুপিডগুলো সব গরু-ভেড়ার মতো পালাচ্ছে। চাকর জোটানোও হয়ে পড়েছে মুশকিল। অবিশ্যি আমি একটু সময় করতে পারলে এরই মধ্যে একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত, কিন্তু—'

যোগেশবাবুর কথা শেষ না হতেই একটি লোক এসে জোড়হস্তে দরজায় দাঁড়ালো। রোগা ঢেঙা শরীর, কাঁধদুটো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অতিরিক্ত চওড়া চোয়াল, চোখ দুটো ঘোলাটে, দৃষ্টিটা মনে হয় অর্থহীন।

তার কর্কশ কণ্ঠ যথাসম্ভব বিনীত ক'রে বললো, 'আজ্ঞে শুনলাম আপনাদের চাকরের দরকার আছে—'

যাক বাঁচা গেল ভৃত্যহীনতা নিয়ে একটু ভাবিত না হয়েছিলাম এমন নয়। একে মেস তার ওপর আজই প্রথম দিন, চাকর ছাড়া কি ক'রে কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার ভাগ্যেই হোক আর উমেদারের নিজ 'ভাগ্যেই হোক এখন বহাল হলেই হয়—যদিও যোগেশবাবুর মুখের ভাবটা বিশেষ আশাপ্রদ মনে হলো না।

যোগেশবাবু লোকটির আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'নাম কি ?'

'আজ্ঞে নিবারণ।'

'নিবারণ—হুঁ—এর আগে কোথায় চাকরি করতে, কি ক'রে জানলে এখানে চাকর নেই ?'

চলতি প্রশ্নের মামুলি জবাব পেয়েই যোগেশবাবু সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, 'জামা কাপড় এত নোংরা কেন ?' আবার তাকালেন। 'ওঃ হরীবল্—না না এমন নোংরা লোক আমি রাখবো না।'

শেষ পর্যন্ত লোকটাকে বিদায় ক'রেই দিচ্ছেন দেখে ইংরিজিতে বলতে গেলাম, 'যদ্দিন না একটা ভালো লোক জুটছে—'

কথা তিনি শেষ করতে দিলেন না। কূটনৈতিক চালে হাতের সামান্য একটু ইঙ্গিতে আমাকে থামিয়ে দিলেন।

নিবারণ জোড়হস্তে জানায়, চার পয়সা মূল্যের একটি মেটে-সাবান পেলেই এ ত্রুটি সে সংশোধন ক'রে নিতে পারবে। একে মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার, তাতে চাকরি নেই—তার ওপর যা শীত—একখানা কাপড আর একটা মাত্র জামা, ভেজানো আর হয়ে ওঠে না—ইত্যাদি অনেক কথাই সবিনয়ে নিবেদন করে নিবারণ। আগ্রহটা তার অনুনয়বিনয়ের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—চাকরি একটা তার একান্ত প্রয়োজন।

মাইনে থেকে সুরু ক'রে এটা-ওটা নানা কথা নিয়ে আধঘন্টা বকাঝকার পর যোগেশবাবু রায় দিলেন, 'আচ্ছা যাও কাজে লেগে যাও, দু'চারদিন দেখে পছন্দ হয় রাখবো নয় তো না।'

অস্থায়ীভাবে নিবারণ বহাল হলো। বেরুবার মুখে যোগেশ-বাবু বললেন, 'তখন আপনাকে থামিয়ে দিলাম কেন বুঝতে পেরেছেন ?'

আশ্চর্য হয়ে মাথা নেড়ে জানালাম, না। বুঝবার মতো কিছু ছিল ব'লে এখনও মনে করতে পারলাম না।

যোগেশবাবুর মুখে একটু অর্থপূর্ণ হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। আবার গম্ভীর হলেন। 'এ সব চাকর-বাকরের ব্যাপার—হুঁ—যাক, আমার আবার সময় হয়ে গেল।'

ধীর পাদক্ষেপে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

চাকর-বাকরের ব্যাপারের মধ্যে রহস্যজনক এমন কি থাকতে

পারে যা আমি বুঝলাম না! এমন কি বললে বুঝবো কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ ক'রে তিনি প্রস্থান করলেন। সকলের ওপরেই একটা শিক্ষকসুলভ অনুকম্পা। অবিশ্যি পরে তার এই অর্থপূর্ণ মৃদুহাস্যের সঙ্গে বহুবারই পরিচয় ঘটেছে। যে-কোনো আলোচনায় দু'চার কথা ব'লেই তিনি থেমে যান, ঠোঁটের কোণে দেখা দেয় এই হাসি। ভাবটা এই, এ বিষয়ে বলতে গেলে বলার শেষ নেই—আমার কিন্তু বরাবর মনে হয়েছে বলা তাঁর শেষ হয়ে যায় বলেই তিনি থামেন। কিন্তু এই হাসির দৌলতে বিজ্ঞলোক ব'লে মেম্বরদের মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন সে কথাও সত্যি।

পাঁচটা বাজতে ওপর-নিচ থেকে সমানে ডাক সুরু হলো, নিবারণ—নিবারণ। চা-পিপাসীদের বৈকালিক আর্তনাদ।

যোগেশবাবুও হাঁক ছাড়লেন। এল নিবারণ। হুকুম করলেন পেয়ালা নাবিয়ে আনতে। ঘরের এক কোণে একটা কেরোসিন কাঠের র‍্যাক, তার দুটো গর্তে ঢোকানো রয়েছে দুটো কাচের গ্লাস, দুটো হুকে ঝুলছে দুটো পেয়ালা। নিবারণের চোখ সেদিকে পড়লো না। সে খুদ-কুড়োনো দৃষ্টি নিয়ে টেবিলের এখানে-সেখানে হাত বাড়াতে লাগলো।

'এখানে নয়, ঐ যে দেয়ালের গায় র‍্যাক-এ।' যোগেশবাবু ধমকের সুরে বললেন।

নিবারণ তার অর্থহীন দৃষ্টি মেলে বার দুই তাকালো দেয়ালের দিকে, তারপর এগিয়ে গেল। অনেকটা হাতড়েই একটা পেয়ালাকে সে ধরলো।

যোগেশবাবু ধমকে উঠলেন, 'চোখে দেখতে পাস্ না নাকি, এঁ্যা—নিশ্চয়ই চোখে কম দেখিস—' আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'দেখুন, একে দেখেই আমার মনে হয়েছিলো ওর আইসাইট খারাপ—না, কানা নিয়ে তো কাজ চলবে না।'

'কানা—কানা কেন হতে যাব বাবু! ঐ কোণটা অন্ধকার তাই—'

'চোখে কম দেখিস ব'লেই অন্ধকার ঠেকছে তোর কাছে। আমি বলছি তুই চোখে কম দেখিস—বল সত্যি ক'রে ?'

'না বাবু চোখে কম দেখতে যাব কেন—, পেয়ালা নিয়ে নিবারণ বেরিয়ে গেল।

যোগেশবাবু সেদিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন, বুঝা গেল কথাটা স্বীকার ক'রে না যাওয়ায় তিনি যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

ঘরটায় আলো ঢোকে কম, ঐ কোণটায় আরো কম, তবে কিনা দেখতে না পাওয়ার মতো নয়। লোকটির চোখে দোষ আছে সন্দেহ নেই।

যোগেশবাবু সকলের শেষে খান, আমিও গেলাম তাঁরই সঙ্গে।

নিবারণ কলসি কাত ক'রে দু'গেলাস জল গড়িয়ে আনলো।

হাত ধুতে গিয়ে দেখি আদ্ধেক গেলাস জল। বললাম, 'এ কি গেলাস ভ'রে দাও নি কেন ?'

যোগেশবাবু তখনও গেলাসে হাত দেন নি, শোনামাত্রই তাকালেন গেলাসের দিকে। 'বলেছি বেটা চোখে কম দেখে। কতটা গড়াচ্ছে আন্দাজ পায় না আর কি—' তীব্র দৃষ্টিতে চাইলেন নিবারণের দিকে। 'কি আদ্ধেকটা জল ভরেছিস কেন ?'

'খান না, লাগে তো আবার দেবখন।'

'সে-কথা হচ্ছে না—চোখে দেখতে পাস না হতভাগা সেটা বলিস না কেন, অ্যাঁ ?'

'চোখে দেখতে পাব না কেন বাবু, খুব পাই, খালি খালি আপনি এক কথা বলছেন।'

নিবারণও কিছুতেই স্বীকার পাবে না। নিশ্চয়ই তার ভয় এ কথা স্বীকার করার পর চাকরি তার ছুটে যাবে।

যোগেশবাবুর মুখচোখ গম্ভীর হলো। ভারি গলায় বললেন, 'এখনও সত্যি কথা বল বলছি, মিথ্যে বললে কালকেই তোকে তাড়াবো।'

কথাটা নিবারণ বিশ্বাস করে না নিশ্চয়ই। সে জানে সত্য কথা বলায় যে-টুকু গুণ প্রকাশ পাবে তার চেয়ে অনেক বড়-দোষ প্রমাণিত হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গেই। চাকরি থাকার পক্ষে যেটা একেবারেই অনুকূল নয়। তাই নিবারণও হ্যাঁ বলে না কিছুতেই।

তমসা

অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কাশির আওয়াজে—নিবারণ কাশছে। অমন কাশির আওয়াজ কখনো শুনিনি। যেন বিলিতি করতাল ঠুকছে—ঝম্ করে একটা শব্দ এক মিনিট।

'শুনছেন মশায়, জেগে আছেন না ঘুমুচ্ছেন—' যোগেশবাবু ডাকলেন।

বললাম, 'জেগেই আছি, বলুন।'

টের পেলাম যোগেশবাবু উঠে বসলেন। 'শুনছেন কাশির শব্দ—কোনো রকম ব্যাড টাইপের নয় তো?' শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করলেন।

'কি ক'রে বলবো বলুন, হতেও বা পারে।'

'হতেও বা পারে, বলেন কি—ব্যাটাকে তো তাড়াতে হচ্ছে।'

সকালে উঠেই ডাকলেন নিবারণকে। 'কি, তোর কোনো কাশির ব্যারাম আছে?'

'না বাবু কাশির ব্যারাম থাকবে কেন, কটা দিন ঠাণ্ডা লেগেছিল তাই—'

'এ তো ঠাণ্ডার কাশি নয়।'

'হ্যাঁ বাবু ঠাণ্ডার কাশি—ডাক্তার বললে ঠাণ্ডার কাশি—আপনার যেন বাক্যিতে পেত্যয়ই হয় না।'

'অ্যাঁ, আবার কেতাবি ভাষা বলা হচ্ছে, 'বাক্যিতে পেত্যয়ই হয় না—' বিকৃত সুরে ব'লে উঠলেন যোগেশবাবু। 'ডাক্তারকে দেখিয়েছিলি তা হলে?'

'আজ্ঞে হাঁা।'

ডাক্তারের কথা শুনে যোগেশবাবু যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তবুও নিবারণ বেরিয়ে যেতেই জানিয়ে দিলেন ওকে বিদেয় করা সম্পর্কে তিনি স্থির সংকল্প। লোক জুটছে না ব'লে নিবারণ কিন্তু থেকেই গেল। নিবারণের থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয় কারুর কাছেই—এমন লোক দিয়ে কাজ চলতে পারে না। সদরের কড়া নেড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তেতলার রান্নাঘর থেকে একটি একটি সিঁড়ি বেয়ে নাবতেই তার দশ মিনিট। এমনিতে বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, এই চোখের জন্যেই হয়তো কোথাও চাকরি টেকে না।

সেদিন তো আমারও মেজাজ রীতিমতো খারাপ হয়ে গেল। কড়া নেড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়! ব'সে-ব'সে নাবলেও তো এর আগে পৌঁছনো উচিত। কড়া একটা ধমক দিয়ে ওপরে চ'লে গেলাম।

পরের দিন সকালে দেখা গেল নিবারণের বাম ভ্রূর পাশে বড রকমের একটা আঘাতের দাগ—তার ওপর চুন হলুদ চাপানো, আশপাশে চাপ-চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে।

চোখে পড়তেই যোগেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি হয়েছে, কপাল কাটলো কি ক'রে?'

'আজ্ঞে কাল বাবুকে দরজা খুলে দিতে গিয়ে ডাণ্ডাটা ছিটকে এসে লাগলো—'

'হুঁ, ওটায় স্প্রিং আঁটা রয়েছে কিনা ছিট্‌কে গিয়ে লাগলো

তোর কপালে—ব্যাটা এমন বজ্জাত তবু সত্য কথা বলবে না। আরে মশাই চোখে দেখতে পায় না, নাবতে গিয়ে কোথায় কপাল ঠুকে গেছে—দরজার রডটা কখনো গিয়ে এভাবে লাগতে পারে!'

'লাগলো তো বাবু—' বিড়বিড় ক'রে আরও কি যেন বলতে বলতে নিবারণ বেরিয়ে গেল।

'আচ্ছা আপনিই বলুন, ব্যাটার আইসাইট খারাপ নয়?' আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'কি জানি হয়তো হবে—'

'হয়তো নয়, আই এ্যাম সিওর—'

তাঁর কথার সমর্থনে কোনোই উৎসাহ প্রকাশ করলাম না। এমন একটা মোটা ব্যাপারকে প্রমাণ করতে এতটা উঠেপড়ে লাগবার কি আছে! আর লোকটাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেবারই বা প্রয়োজনটা কি?

সেদিন খেতে ব'সে রীতিমতো একটা গোলযোগ বেধে গেল।

যোগেশবাবু খাবার সময় উরুতে কনুই রেখে একেবারে ঝুঁকে পড়েন থালার ওপরে। মুখ আর খাদ্যবস্তুর ব্যাবধানটা যথাসম্ভব কমানোই এর উদ্দেশ্য না দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতাই এর কারণ বলা কঠিন। বেশ মনোযোগের সঙ্গে খাচ্ছেন, হঠাৎ হাঁক ছাড়লেন, 'নিবারণ—'

কি ব্যাপার! ছাই দিয়ে থালা মাজা হয়েছে তারই

খানিকটা তখনও লেগে আছে থালার গায়। যোগেশবাবু ভয়ানক রকম রেগে উঠে গালাগাল করতে লাগলেন। 'কানা চোখে দেখতে পাস না সেটা বল—এমন সব কাণ্ড করবে তবু হারামজাদা সত্য কথা বলবে না—'

'এতে বাবু চোখে দেখা না দেখার কি আছে—তাড়াতাড়ি ধুয়ে আনতে—'

কথা শেষ হলো না, যোগেশবাবু দাঁড়িয়ে প'ড়ে সজোরে এক চড় কষিয়ে দিলেন তার গালে।

নিবারণ কিন্তু ক্রুদ্ধ হবার পরিবর্তে যোগেশবাবুর পায় হাত দিয়ে বার বার বলতে লাগলো, 'এমন অন্যায় আর হবে না বাবু, এবারটি মাপ করুন।'

'তবু ব্যাটা স্বীকার করবে না যে চোখে দেখতে পায় না।' যোগেশবাবু শান্ত হয়ে ব'সে থালা পালটে দেবার হুকুম করলেন।

ঘরে এসে আমাকে বললেন, 'দেখলেন তো, এই যে গালাগাল আর মার খেলো তবু কিন্তু কাজটি ছাড়তে চাইলো না—ব্যাটা আসল বজ্জাত—'

মার দেওয়াটা মোটেই সমর্থন করতে পারিনি, মনে মনে একটু কষ্ট হয়েছিলাম। অসন্তুষ্টি গোপন না ক'রেই বললাম, 'এতে বজ্জাতির কি আছে—ঘরে ভাত নেই ব'লেই চড় খেয়েও চাকরি করতে হয়।'

যোগেশবাবুর মুখে সেই হাসি। 'বাড়ির চাকরকে একটা জোর ধমক মেরে দেখবেন তো, তক্ষুণি সেও মেজাজ দেখিয়ে

চাকরিতে ইস্তফা দেবে। ওদের আবার আনএম্প্লয়মেন্ট প্রবলেম আছে নাকি। মেস-এর চাকরের চুরির রেট কমার একমাত্র উপায় হলো বকাঝকা, যত বেশি সইবে ততই বুঝবেন জোর হাত চলছে—তাই বলছিলাম ব্যাটা আসল বজ্জাত—'

জ্যামিতিক পদ্ধতিতে কথাটা প্রমাণ ক'রেও আবার বিসদ ব্যাখ্যায় বুঝিয়ে বললেন—হয়তো এ বিষয়ে বক্তব্য একটা কিছু আছে ব'লেই শুধু মৃদু হাসি নিয়ে দুর্বোধ্য হয়ে রইলেন না।

এর পর দিনদুই কেটে গেছে। আপিস ফেরতা ঘরে ঢুকতে যাব, জানলা দিয়ে নিবারণের কাণ্ড দেখে থেমে গেলাম। রবার সোল জুতো নিয়ে নিঃশব্দে এসে ঢুকেছি, আমার অস্তিত্ব নিবারণ টের পায়নি।

নিবারণের চোখে যোগেশবাবুর চশমা। হাত বাড়িয়ে এটা সেটা ধরছে। চোখেমুখে একটি প্রসন্ন হাসি। একটা বই খুলে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ, বুঝলাম পড়ছে—বাংলা লেখা-পড়া সামান্য জানে তার প্রমাণ ইতিপূর্বে হিসেবের চিরকুট থেকেই পেয়েছিলাম।

আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়—ওরই ভালোর জন্যে ওকে সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত। ধরা প'ড়ে আবার একদিন মারধর খাবে যোগেশবাবুর হাতে। ঘরে ঢুকে পড়লাম। আমাকে দেখেই ত্রস্তে চসমাটা নাবিয়ে রাখলো টেবিলে। কিছু বলতে যাব এমন সময় যোগেশবাবুও সশব্দে বেরিয়ে এলেন

বাথরুম থেকে। আর বলা হলো না—ভীত নিবারণও চট্‌পট্‌ স'রে পড়লো ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ পরে চা দিতে এসে সে বুঝতে পারলো যোগেশ-বাবুকে আমি কিছু বলিনি। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

যোগেশবাবু চা খেয়ে পেয়ালাটা নাবিয়ে রাখলেন মেঝেয়। নিবারণ ঘর ঝাঁট দিতে এল। হঠাৎ তার ঝাঁটার টান লেগে সশব্দে পেয়ালাটা গড়িয়ে গেল। যোগেশবাবু চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠলেন। পেয়ালাটা অক্ষতই রয়েছে তবু যোগেশবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, 'হারামজাদা তবু বলবে ও দেখতে পায়—পেয়ালাটা ভাঙলে আজ তোমার মাথাও আমি ভাঙতাম—'

'গাল দেবেন না বলছি বাবু—হুঁ—' সেদিন যে নিবারণ মার খেয়েও পা ধরেছিলো আজ সে রীতিমতো শিরদাঁড়া খাড়া ক'রে রুখে উঠলো। 'না রাখতে হয় না রাখবেন, হিসেব চুকিয়ে দিন কালই চলে যাব।'

নিবারণের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে প্রথমটা যোগেশবাবু যেন একটু থমকে গেলেন। তারপর সামলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'ভারি যে তেজ বেড়েছে দেখছি। ভেবেছ আমাদের লোক জুটছে না—উঁ? কাল সকালেই তোকে বিদেয় করবো—নেই মাঙ্‌তা তোর মতো কানাখোঁড়া—লায়ার—'

'বেশ তাই করবেন। গাল খেয়ে চাকরি করতে পারবো

না—হুঁ—' নিবারণও বেশ মেজাজের ওপরই কথা কটা ব'লে বেরিয়ে গেল।

'ঠিক বলছি, কাল বিদেয় করার সময় দেখবেন পায় ধ'রে কাঁদবে—হারামজাদা ব্যাটাদের আমি চিনি না—ভেবেছে লোক জুটলে তো তাড়াবে।'

যোগেশবাবু বললেন।

পরের দিন সত্যি সত্যিই যোগেশবাবু নিবারণের হিসেব চুকিয়ে দিলেন।

নিবারণ কিন্তু মোটেই আপত্তি করলো না—অনুরোধ-উপরোধ তো দূরের কথা। যোগেশবাবু অবাক তো হলেনই, একটু লজ্জিতও বোধ করলেন। তাঁর হিসেবে ভুল! আমার দিকে আর চোখ তুলে ভালো ক'রে তাকালেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পরই নিবারণ চ'লে যাবে। যোগেশবাবু সবাইকে ভরসা দিলেন বিকেলেই তিনি চাকর এনে হাজির করবেন—ভাবনার কোনোই কারণ নেই। অতএব অন্যান্য মেম্বরদের তরফ থেকেও আর কোনো আপত্তি উঠলো না।

স্নান সেরে ঘরে ঢুকে যোগেশবাবু টেবিলের এদিক-ওদিক হাতড়াচ্ছিলেন, আমি ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'আমার চশমাটা পাচ্ছিনে মশাই—'

বললাম, 'ভালো ক'রে খুঁজে দেখুন এখানেই আছে, চশমা আর যাবে কোথায়—কোথায় রেখেছিলেন ?'

'এই তো এখানে রেখে এই মাত্র স্নান করতে গেছি !'

টেবিল বিছানা এখান-ওখান তচনচ ক'রেও পাওয়া গেল না চশমা।

'চশমাটা যাবে কোথায় মশাই—' চিন্তিত মুখে যোগেশ-বাবু বললেন।

হঠাৎ গত সন্ধ্যার ঘটনাটা মনে পড়লো। বললাম, 'নিবারণ নিয়ে পালায় নি তো?'

'রাইট ও—ঠিক বলেছেন।' যোগেশবাবু হাঁক ছাড়লেন, 'নিবারণ—নিবারণ—'

কোথায় নিবারণ! নিবারণ পালিয়েছে। খবর শোনা মাত্র সকলেই নিজ নিজ জিনিসগুলো একবার মিলিয়ে দেখলো —কারুর তৃণটুকুও খোয়া যায়নি, গেছে শুধু যোগেশবাবুর চশমাটি।

যোগেশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'এই যুদ্ধের বাজারে একটা চশমার দাম চাইবে তিরিশ টাকা—'

টাকার দুঃখকে ছাপিয়ে সহসা তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'কেমন বলেছিলাম কিনা লোকটার আইসাইট খারাপ—'

ঠোঁটের কোণে দেখা দিল সেই বিজ্ঞতার হাসি।

এক ফালি

গলিটা শুধু বয়সেই পুরোনো নয়, আকৃতিতেও নিতান্ত পুরোনো। সংকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন রাস্তার একপাশে বস্তি—কুৎসিত দুর্বল ঘরগুলি একে অন্যের কোমরে বা কাঁধে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক থেকে গা বাঁচিয়ে দিব্য একখণ্ড ঘাসের গালচের উপর দর্পভরে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা বা স্পর্ধা এদের নেই। যৌথশক্তি নিয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপক্ষে লড়াই ক'রে টিকে থাকতে হয় এদের। আশেপাশে একতলা ও দোতলা অনেকগুলো বাড়ি। হাওয়ার তরফ থেকে চলাচলের জন্যে জোরজুলুমে কয়েক ফুট জমি ছিনিয়ে নেবার মতো ক্ষমতার অস্তিত্ব এদের জন্মকালে ছিলো না, তাই দু' বাড়ির মধ্যবর্তি এক চুল জমিরও অসদ্ব্যবহার হয়নি। ঘেঁষাঘেঁষি এই বাড়িগুলোর অতি জীর্ণ একটা দোতলার নিচের তলায় একখানা ঘরে কয়েক দিন হলো রণেশ এসে উঠেছে—শুধু রণেশ নয়, শ্রী রণেশ, বি-এ।

অন্তত এই সে বলে ও লেখে। লোকে হাসে—বি-এ তো ঘাটেপথে, ও আবার জাহির করা। ব্যানার্জি, বোস এসবই বা এমন কি ক্বচিৎ ঘটনা। শ্রেণীবাচক পদবিটা তাই নিরর্থক বোধে ছেঁটে ফেলেছে। যুগের ব্রাহ্মণ্য বোঝাতে যে পদবির

প্রয়োজন শুধু সেটিই জুড়ে দেয় নামের পেছনে। আধুনিক কেতায় নামটিকে পর্যন্ত শ্রীহীন করা সে সমর্থন করে না। শ্রী লুপ্ত হয়েছে জীবনের সব দিক থেকে, শুধু তার চিহ্নটুকু টিকে আছে নামের আগে—রণেশ সেটা বড় হরফে লেখে, জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করে।

এম-এ পড়ার আগ্রহ আছে, সামর্থ্য নেই। চাকরির ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। ব্যর্থ হয়ে ঘুরেফিরে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। আজ একটা পেরেক সংগ্রহ ক'রে এনেছে। এসে পর্যন্ত ঘরের মধ্যে জামা ঝুলিয়ে রাখার মতো একটা অবলম্বন খুঁজে পায় নি—শোবার আগে অসুবিধাটা বোধ করে। জামাটা হাতে নিয়ে এখানে ওখানে চেষ্টার পর টিনের স্যুটকেসটার উপর স্তূপ ক'রে রেখেই শুয়ে পড়তে হয়।

পেরেকটাকে দেয়ালের গায়ে বসিয়ে তার মাথায় রুমাল জড়িয়ে নেয় রণেশ। পেরেক তো দূরের কথা, পুরোনো জামা র‍্যাকে রাখা পর্যন্ত নিরাপদ নয়। পিসীমার বাড়ি সেদিন একটা জামার ঘাড় ফুঁড়ে র‍্যাকের সুডৌল মাথাটা বেরিয়ে এসেছিলো।

রণেশ শুয়ে পড়ে। চিন্তাগুলো যেন ছারপোকার সঙ্গে বালিশের তলায় লুকিয়ে থাকে, মাথা রাখতেই কিলবিলিয়ে নানা দিক থেকে আক্রমণ করে। ছারপোকা ছিলো না মোটে, এসেছে পিসীমার ঐ গোমস্তার বিছানা থেকে—বড় নোংরা লোকটা।

হাতল-ভাঙা পেয়ালায় চা পান ক'রে বেকার অবস্থাটা পিসীমার বাড়ি হয়তো মন্দ কাটতো না। কিন্তু অত পেয়ালা থাকতে হাতাল-ভাঙাটা সকলের মধ্যে বিশেষ ক'রে তাকেই দেওয়া কেন—রণেশের লজ্জা করতো, হাসি পেতো, রাগ হতো। ভোজ্যবস্তুতে বৈষম্যের না হয় মানে হয়—পিসীমার এ অহেতুক ক্ষুদ্রতা বা বড়মানষি প্রকাশের পথটা বন্ধ করতে গোপনে পেয়ালাটা পকেটে পুরে নিয়ে রাস্তায় ডাস্টবিন-এ ফেলে দিলো। পরের দিন রণেশের চা পান আধ ঘণ্টার জন্য স্থগিত। বাড়িময় পেয়ালাটার খোঁজ প'ড়ে গেল। ভাঙা ভাগ্যের কল্যাণে ভাঙা বস্তুর কি ভাগ্য !

হঠাৎ মনে পড়া ঘটনার মতো রণেশ এক ফাঁকে সত্য কথাটা পিসীমাকে ব'লে বসলো। ছেলেদের মধ্যে কেউ মুখটিপে হাসলো, পিসীমা যা মুখে আসে বলতে লাগলেন। ফলে রণেশ সাত টাকা ভাড়ায় একটি ঘর নিয়ে ফেললো—মেস-এ থাকা সে বরদাস্ত করতে পারে না।

পিসীমার স্বভাবটা বড়ো স্থূল। পিসতুত বোন বীণার মধ্যে শিক্ষার সামান্য সূক্ষ্মতা আছে, কিন্তু মূলত দুই-ই সমান। বীণা বলে, 'কিছু হবে না রণেশদার, জানে কেবল পাকা-পাকা কথা বলতে।' কথাগুলো ভালো লাগে নিশ্চয়ই। কিছু হয় কি না হয় দেখতেই পাবে।' কেন হবে না। সে শুধু পাশই করেনি, পড়াশোনাও করেছে বিস্তর, বুদ্ধি আছে, সর্বোপরি আছে একটা অ্যামবিশন। অ্যামবিশন কথাটা তেমন জোর

ধরে না। বিশেষত্বহীন, ভদ্রলোক মাত্রেরই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। সাফল্যের প্রতীক্ষায় পুত্র-প্রপৌত্রে চলতে থাকে। মধ্যবিত্তের ঘরে জন্ম—লটারির টিকেট, নিলেই আশা করার অধিকার জন্মায়।

অসহ্য ছারপোকা। বার বার উঠে আলো জ্বালতে ইচ্ছে হয় না। আক্রমণের ক্ষেত্রটা রণেশ হাত দিয়ে ঘ'ষে দেয়, দুর্গন্ধ নাকে আসে, সাময়িক নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বোজে। পাশের ঘরের লোকটির নাসাগর্জন শোনা যাচ্ছে—লোকটা এরই মধ্যে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশি ঘুম স্থূল প্রকৃতির বা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ, সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্নের নয়, ঘুম সেখানে সন্ত্রস্ত ও সংকুচিত। ধীমান লোকের ঘুম যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে আসে না—রণেশ নড়েচড়ে পাশ ফিরে শোয়।

একত্রিশ দিনে মাস। ঘর ভাড়ার বিষয়ে আরও একুশ দিন নিশ্চিন্ত। 'পেমেণ্ট'-এর জন্যে 'ফার্স্ট উইক'—আরও সাত দিন, ইতিমধ্যে কিছু একটা জুটে যাবে। আজ শেষ বইখানা বিক্রি করা হয়েছে, এর পর দৈনিক খরচা সংগ্রহ এত সহজ হবে না। ধার পাওয়া সব চাইতে মুস্কিল। বন্ধুবান্ধব সবারই মুখে এক কথা, এককালে কথায় কথায় টাকা দিয়েছে, অনেক ঠেকে ও ঠকে নাকি শিক্ষা হয়েছে। কারুর কাছে শিক্ষাদাতাদের একজন হবার সৌভাগ্য হলো না—রণেশের দুঃখ হয়। টাকা-পয়সা সম্পর্কে নিজের বিচারবুদ্ধি এবং অপরের সাধুবুদ্ধির ওপর লোক আস্থা হারিয়েছে। বিশ্বাসহীন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়

কম। বালক বা স্ত্রীলোকের কাছে অচল দু'আনিটি পর্যন্ত চালানোর জো নেই, দশবার বাজিয়ে দশজনকে দেখিয়েও সন্দেহ ঘোচে না। জিভের পথ বন্ধ ক'রে তবে লোক ঠকার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। শুধু হাতে ব্যবসার কথা ফাঁদলে শুধু সন্দেহের চোখে তাকায়। চাকরি ছাড়া উপায় নেই। সুরুতে দরখাস্ত ছাড়লেই আশায় মন ভ'রে থাকতো, অধুনা বিকারহীন হয়েছে। সবকটা দরখাস্তই নিরুত্তর। কিন্তু চাকরি একটা চাই-ই। অনিলা অপেক্ষা ক'রে আছে, প্রথম সুযোগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। উচ্চতর জীবনযাত্রার লোভে 'বিশেষরূপে বহন' কার্যটা মুলতুবি রাখা বিশেষ মূর্খতার কাজ। গৃহলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে স্বর্ণাসনের নির্মাণ চলতে থাকে, যেদিন সমাপ্ত হয় তাকে অপরিসীম আগ্রহে অভ্যর্থনা করার লোকটির সন্ধান আর মেলে না—গৃহেশ্বরীর সেই আসনের তলায় তখন সে সমাধিস্থ।

অনিলার আগ্রহের অন্ত নেই। শুনতে ভালো শোনায় তাই বলে, 'দু'জনে না হয় গাছতলায় দিন কাটাবো।' নিজের বাড়ির উদ্যান সংলগ্ন বৃক্ষতল হলে প্রস্তাবটা নেহাৎ মন্দ ছিল না। দক্ষিণ প্রান্তের বাড়িগুলোর কি অপরূপ গঠন—আধুনিক স্থাপত্যের উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাটা সব চেয়ে বড় কথা। অনিলার সখ একটি বাথরুমের। বন্ধুর বাড়ির বাথরুম বোঝাতে গিয়ে রীতিমতো একটা নক্সাই এঁকে ফেলেছিলো। সর্বাঙ্গীন সুন্দর বাথরুম তো চাই-ই, তা

ছাড়া দক্ষিণে থাকবে বিস্তর চওড়া একটা বারান্দা, সান্ধ্য চা-এর উপলক্ষে সেখানে বসবে জমাট একটি আড্ডা।

সাত টাকার ঘরে সাতাশ হাজারের খসড়ায় গা ঢাকা দিয়ে ঘুম এসে মেঝের বিছানো বিছানাকে আশ্রয় করে।

চর্র্—পট্—পট্ উড়িষ্যাবাসীর হস্তে নগর-পথের গঙ্গাস্নান সুরু হলো। হোজ-পাইপের গর্তটা ঠিক জানালার নিচে, রণেশের ঘুম ছুটে যায়। সদ্যস্নাত রাস্তাদিয়ে স্নানার্থীদের যাতায়াত আর কথাবার্তা কানে আসে। নিদ্রাদেবীর প্রত্যাবর্তনের পালা চলতে থাকে, সম্পূর্ণ না হতেই দম বন্ধ ক'রে উঠে বসতে হয়। কয়লার ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেছে—কলকাতায় প্রতিবেশীদের একমাত্র আদান-প্রদান। রণেশ উঠে জানালাটা বন্ধ ক'রে দেয়।

বেশ বেলা হয়েছে। শয্যা ত্যাগের তাড়া নেই। হাতে জল লাগার পূর্বাবস্থাটা নাকি হস্তরেখা বিচারের পক্ষে প্রশস্ত—অভ্যাস মতো হাতের তেলোটাকে রণেশ চোখের সামনে বিছিয়ে ধরে। সূক্ষ্ম নজরে সুলক্ষণ আবিষ্কারের চেষ্টা চলে। মুঠো খুললে ভরসা করার মতো সম্বল বলতে দেখা দেয় গুটিকয় রেখা—নির্ভর না ক'রে উপায় নেই। ঊর্ধ্বরেখাটা বাড়তির মুখে আর একটু যেন স্পষ্ট হয়েছে। বিয়ের ব্যাপার হাত দেখে বলা কঠিন, ভালো দেখিয়েরাও স্বীকার করে। রাশিচক্রটা সঙ্গে নেই, থাকলে মন্দ হতো না। সুদূর তার-কাটির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার কথা ভাবতে গেলে বিস্ময়

লাগে। বিশ্বের বিধিবদ্ধ ঘটনা স্রোতে মানুষের জীবন বস্তুরই মতো ঘটনাধীন, না মেনে উপাই নেই।

মনের অবস্থা আজ একটু অতিরিক্ত দার্শনিক। শেষ বই-এর শেষ পয়সা খরচ হয়ে গেছে। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শয্যায় শুয়ে অর্থকরী সক্রিয়তার বিবিধ পন্থা নিয়ে মনের মধ্যে আলোচনা চলছে। কাজ সম্পর্কে অত বাছবিচার বলেই না কাজ জোটে না—দেহ মন নিয়ে কাজ, বিচারহীন হাওয়াও সম্ভব নয়। নড়বড়ে ঘাড়ের ডগায় মূল্যবান সব মস্তিষ্ক নিয়ে ক্রেতাহীন বাজারের অসংখ্য ফেরিওয়ালা। 'দেশীছিট কাপড়েওয়ালা' 'লেস-ফিতা-কাটা চাই'—তুচ্ছ বস্তুর ব্যাপারী, তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি তাদের ওপর। শ্রমিক ও কৃষকের নামে মধ্যবিত্তের কলম কাগজের বুকে ডুকরে কাঁদে ; ব্যথার উৎস নিজের বুকে—সহানুভূতি নয়, স্বানুভূতি।

—রণেশবাবু ঘরে আছেন ?

পাশের ঘরের লোকটির গলা। জানালায় উঁকি দিয়ে বললেন—দশটা বাজে এখনো বিছানায় শুয়ে! আপনার একখানা চিঠি কাল এসেছে, দিতে স্মরণ ছিল না। ব'লে, ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিলো।

চিঠি প'ড়ে রণেশ চিন্তিত ও চঞ্চল হলো। লোকটা কি রকম দায়িত্বজ্ঞানশূন্য—স্মরণ ছিল না বললেই যেন সব ল্যাঠা চুকে গেল। চিঠিটা কাল পেলে কোনোই অসুবিধা ছিল না, কিন্তু এখন কি করা যায় ? একটা দরখাস্তের জবাবে আজ

এগারোটায় সাক্ষাতের জন্ত উপস্থিত থাকতে লিখেছে। একটি তাম্রখণ্ডও পকেটে নেই, যোগাড় করারই বা সময় কই। জামা কাপড় ময়লা, দিন চার-পাঁচ হলো মুখ কামানো হয় নি। একটা কাচের গেলাস পেলে নখকাটা ব্লেডটায়ই না হয় ধার তোলার চেষ্টা করা যেত। তিন পয়সার জন্যে এতটা পথ হাঁটতেও মন সরে না। জুতোর যা অবস্থা অতটা পথ চলার আগেই হয়তো হাস্যকর চেহারা নেবে। পাশের ঘরের লোকটির ওপর মন তিক্ত হ'য়ে ওঠে। ওর কাছ থেকেই ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে—সময় মতো ভাড়া না দেবার যেন একটা যুক্তি হাতে আসে।

চিন্তিত অবস্থায় রণেশ ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলো। প্রা—গা—শিশি ওতল কাগ—অ—। একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত। ঘরের কোণে নজর পড়ে। বাকিতে দু'রকম কাগজই চলছে, ইংরিজি আর বাংলা।

—এই কাগজ—

চটের মস্ত থলে কাঁধে লোকটি এসে দরজায় দাঁড়ালো।

—কত ক'রে নিচ্ছিস ?

—দেখি বাবু কি কাগজ। 'আনন্দবাজার—ও বাবু দু'পয়সা।

—যা, যা, চার পয়সা হরদম বিক্রি হচ্ছে।

—চার পয়সা বাবু স্টেস্‌মেন।

—অমৃতবাজার ?

—তিন পয়সা দেব দিন, ক'খানাই বা আছে কাগজ—

ওজন ও হিসেব সেরে কোমর থেকে ময়লা সরু লম্বা একটা থলে বার ক'রে। মূলধন থেকে পাঁচটি পয়সা গুণে দিলো। যাবার পথ খরচাটা জুটে গেল।

—ও জুতোটা আর চলবে না বাবু, দিয়ে দিন তিন পয়সা দিচ্ছি।

ছেঁড়া জুতোও আবার কেনে নাকি! কিন্তু জুতোর যে দরকার। না কিনে আর ক'দিনই বা চলবে? দেখা সেরে কখন বেরোনো যাবে ঠিক কি—অভুক্ত যাওয়া উচিত হবে না।

জুতোটার কোনো মূল্য স্বীকার করতে সংকোচ হয়। দাম বাড়ানোর চেষ্টা না ক'রে বললো, আচ্ছা নিয়ে যা।

আরও তিন পয়সা গুণে দিয়ে লোকটি চলে গেল। একা ঘরে নিজের কাছেই লজ্জা বোধ হতে থাকে—লোকচক্ষুর অন্তরালে আবার লজ্জা! অপরের এমন কত লজ্জা তার কাছে ঢাকা পড়ে আছে। ডান জুতোর গোড়ালির ঠোকর লেগে মাঝে-মাঝে বাঁ পায়ের গিঁঠটা ছড়ে যায়; অন্যদেরও এমন হয় ব'লে জানা ছিলো না। হঠাৎ কথা উঠে পড়ায় বন্ধুরা বলেছে তাদেরও অমন হয়ে থাকে। গোপন করার মতো কারণ থাকলেই আর জানা হতো না—সবাই চেপে যেত।

পরিচ্ছদের মালিন্য যথাসম্ভব ঢাকা দিতে বাক্স থেকে সিল্কের চাদরটা বার ক'রে গায় জড়িয়ে নিল। ইনটারভিউ

দেবার মতো পরিচ্ছদ বটে—উচ্চ মনোভাব নিয়ে রণেশ হাসে। এজন্যে যদি চাকরি না আটকায় তো ভবিষ্যতে গর্ব করা যাবে। এমন কি মানুষ হতে হলে, অর্থাৎ কিনা চাকরি পেতে হলে কত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় তার নজির হিসেবে উল্লেখ ক'রে উপদেশ পর্যন্ত দেওয়া যাবে। ইংরিজি কাগজটা বগলে চেপে রাস্তায় নেমে পড়লো—লাঠি ও চাদরের মতো বগলে ইংরিজি কাগজও ব্যক্তিত্বে একটা গুরুত্ব আরোপ করে।

এরই মধ্যে ফুটপাথ গরম হয়ে উঠেছে। পায়ের তলায় যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়। রণেশ বাড়িগুলির পাশ ঘেঁসে হাঁটতে থাকে। পাইসহোটেলের চেয়েও সস্তায় খাবার জায়গা সে আবিষ্কার করেছে। পাঁইজির হোটেলে চার পয়সার ভাত নিলে তরকারি আর ডালটা মেলে বিনি পয়সায়। মোড়ের পাঞ্জাবী-দোকানে আহার সেরে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে বসলো। এইটুকুতেই পায়ের তলা দুটো জ্বালা করছে। ভর দুপুরে গলা পিচের ওপর দিয়ে রিক্‌সাওয়ালা মাইলের পর মাইল দৌড়োয়—মানুষ না আর কিছু!

ঠং ঠং ঠং—লাইনের উপর গরুটা স্থির হয়ে আছে। ট্রাম নিকটস্থ হোলে লাইন ছেড়ে দাঁড়ায়। গ্রামের গরু হোলে হকচকিয়ে একটা কাণ্ড ক'রে বসতো, শহরের গরু ধ্যাবড়া নাকে হেসে একটা কিছু ভাবতো নিশ্চয়ই। পাশের সিটে কতকগুলো যাত্রী হট্টগোল করছে, কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় 'স্ট্রাইকারস্'। কাজ কেবল ওরা পায় না, দাবি না মেটালে

ছেড়ে দেয়। নেতা যুবকটি কাছেই ব'সে আছে। নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কাজ জোটাতে পারেনি নিশ্চয়। নিচে থেকে টেনে তোলা, ওপর থেকে টেনে নাবানো, দু'কাজের ভারই মধ্যবিত্তের হাতে—হাত খালি কিনা। আরও এক শতাব্দী আগে মার্কস্ সাহেবের জন্ম নেওয়া উচিত ছিল। তবে হয়তো এ যুগে ব'সে তাঁর দানের স্বাদ গ্রহণ করা যেত। ভদ্রলোক অভাবে প'ড়ে কোট বাঁধা দিয়েছিলেন—রণেশের খালি পা দুটো সগর্বে সামনের সিটে উঠে পড়ে। মার্কসের মা বলতেন, ছেলে আমার যে আন্দাজ 'ক্যাপিটাল' লিখছে তার শতাংশের একাংশ উপার্জন করলে সকলে খেয়ে বাঁচতাম। দারিদ্র্য আর দুঃখই তো উন্নতির সোপান—অবিশ্যি গন্তব্য স্থানে বিদেহী নামটা শুধু পৌঁছবে মনে হলে পাড়ি দেবার উৎসাহ আর থাকে না।

কর্মব্যস্ত ডালহৌসি স্কোয়ার। বিরাট বাড়িগুলো গো-গ্রাসে কেরাণী গিলছে, সন্ধ্যায় নিঃসার ক'রে উগরে দেবে। পরশ্রমজীবীর উচ্ছিষ্ট পেয়ে বহু বুদ্ধিজীবীর জীবন সার্থক হয়েছে, তাদের গাড়ির ভিড়ে গা বাঁচিয়ে ঠিকানা অনুযায়ী রণেশ এগিয়ে চলে।

ফুটপাথে ফলের দোকানে জলেধোয়া কাটা-ফল সাজানো। মেড়োদের খাদ্য। কেরাণীবাবুরা চা ও চপ খেয়ে টিফিন করেন। পোর্টিকোর নিচে লোহার ভাণ্ডে কাঠকয়লার আগুন, তাতে তিনটে ভুট্টা সেঁকা হচ্ছে—ছোটলোকদের ভিটামিন। আশ-পাশে কত কুখাদ্য, হজম করার লোকেরও অভাব নেই।

ফুটপাথ জুড়ে খাড়া হয়ে আছে একটা অতিকায় ষাঁড়। পথচারী মাড়োয়ারী গায়ে হাত বুলিয়ে নমস্কার জানায়। অমন স্থান থেকে স্নেহ ভক্তি না পেলে এমন স্বাস্থ্য হয়! কি দুরন্ত স্বাস্থ্য, একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছে।

পোষাক দেখে হাঁকিয়ে না দেয়। দু'একটা প্রশ্ন করবে নিশ্চয়ই। তা করুক। বিদ্যায় বুদ্ধিতে ছাপিয়ে যাবে এমন কি একটা লোক। এই তো নম্বর। কাটা হাতের আঙুল দিয়ে আপিসের প্রবেশ পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

এমন একটা কাণ্ড রণেশ আশঙ্কা করে নি। আপিসের দরজার সামনে লম্বা এক ফালি জায়গা, প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি যুবক সেখানে ভিড় ক'রে আছে। সকলের পরিচ্ছদই সযত্নকৃত। জনকয়েক পরেছে স্যুট, দু'একটা বেশ দামী। দিশি ব্যাঙ্কের পঞ্চাশটাকা মাইনের চাকরি, শেয়ার বিক্রিয় জন্যে লোক সংগ্রহ করতে হবে, বেতনটা নাকি নির্দিষ্ট।

রণেশের ব্যবহারে দেখা দিল একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ গাম্ভীর্য। শিক্ষা সংস্কৃতি আর আভিজাত্যকে যেন খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখে প্রকটিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করে। সকলেই দাঁড়িয়ে, কেউ এরই মধ্যে পায়চারি করার চেষ্টা করছে, রণেশ গিয়ে বেয়ারার বেঞ্চিটায় ব'সে পড়লো। এ সবই যেন অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার—তবুও মনের তলায় অস্বস্তি আর সংকোচ বোধ একটা থেকে যায় বৈকি।

ম্যানেজারের ঘরে একজনের ডাক পড়লো। সকলেই

নড়েচড়ে উঠলো একবার। এখন একে একে ডাক পড়বে। দামী স্যুট পরা একটি লোক তিন কদম পরিসরে এদিক-ওদিক করছিলো, হঠাৎ রণেশের সামনে এসে বললো, আরে রণেশ-বাবু যে!

কলেজের সহপাঠী, সুন্দরের ওপর বোকা চেহারা। পাঠ্যাবস্থায় রণেশ কোনো দিনই আমল দেয় নি, নামও ভুলে গেছে। একটা কিছু বলবার জন্যেই বলে, এখানে কি মনে ক'রে?

—কিছু না, এমনি।

—কিছু না করার জন্যে এমন সময় এখানে?

উপস্থিত অনেকেরই মতো যুবকটির চোখেমুখেও একটা চাপা উৎকণ্ঠার ভাব। এই মাত্র একটা সিগারেট শেষ হয়েছে, কেস থেকে আর একটা বার করলো। আঙুলের ডগাগুলো কাঁপছে। মধ্যমা আর বুড়োআঙুলের চাপে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সিগারেট থেকে কিছুটা তামাক ফেলে দিল—দেড় পয়সায় কিছু কম দিলেও পারে কোম্পানি। বুড়োআঙুলের নখে বার দুই ঠুকে ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিল। বড়ই অন্যমনস্ক, মনে মনে বোধহয় প্রশ্ন আর জবাবের মহড়া দিচ্ছে। রণেশের পোষাকটা হঠাৎ যেন ভালো ক'রে নজর করলো, বললো, কোনো মিসহ্যাপ হয়েছে বুঝি?

—না। কিন্তু গুরুদশা চলছে, লঘুদশা যে নয় সে তো দেখেই আঁচ করেছেন।

কথাটা ধরতে না পেরে মুখখানা অনর্থক করুণ ক'রে রাখলো।

পরিচ্ছদটা সবশুদ্ধ এতটা অর্থপূর্ণ হয়েছে রণেশের ধারণা ছিল না। একে দাড়িটা কামানো হয় নি, তার ওপর পায়ে নেই জুতো। বেশটা বজায় রাখতে হবে। এ গুরুদশা কেটে গেলে শৌচান্তে শুচি হয়ে তবে পাদুকা বরণ। বেকার হতে বরযাত্রী ব'নে যাওয়া কঠিন কথা নয়। 'আর্জেন্ট' জামা-কাপড় দিন কুড়ি যাবৎ স্টীম-লণ্ড্রিতে প'ড়ে আছে, তিন আনা পেলেই ছাড়িয়ে আনা যায়। পাটভাঙা কাপড়, স্যাণ্ডেল আর মুখে আধ-পয়সা দামের একটা সিগারেট ঝুলিয়ে দিলে উপস্থিত এরাই মনে করতো, বেশ আছে লোকটা।

একে একে সাক্ষাৎ সেরে বেরিয়ে আসছে। কারুর মুখে নিরাশার ছাপটা স্পষ্ট। অভ্যস্তদের মুখ দেখে মনে হয়, ছাড়ানো চীনেবাদামের দানাটা হাত থেকে হড়কে গেল, নতুন উদ্যমে আবার লেগে পড়বে। বড়ো বেশি দেরি হচ্ছে, বার দুই দ্বিধার পর সেই সুবেশ সাহেব রণেশের পাশে ব'সে পড়লো। রুমালে মুখ ও ঘাড় আচ্ছা ক'রে ঘষে নিয়ে অযাচিত ভাবেই সুরু করলো, বুঝলেন রণেশবাবু, এ চাকরিটা তেমন কিছু নয়। দু'মাস পরেই হয়তো বলবে, বিক্রি হচ্ছে না, নেই মাণ্ডতা। এরকমই করে ওরা। একটা ইনসিওরান্স কোম্পানিতে আছি, মেরিটের রেকগনিশন নেই মশাই, লোকের কদর বুঝে সুযোগ-সুবিধে কেউ দেবে না—

আসনটি বাবুদের নীচস্থ হওয়ায় বেয়ারা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। ব'লে উঠলো, যা বলেছেন বাবু লাখ কথার এক

কথা। লোকের কদর বুঝলে কি আর এই টুলে ব'সে হুজুর হুজুর করতে হয়। এই দেখুন না—

ঠুং ঠুং

—হুজৌর—!

কদর না বোঝা পর্যন্ত উপায় নেই।

বেয়ারাটা সমজদার হওয়ায় যুবকটি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়। রণেশ ঘটনাটা উপভোগ করে। সে দেখছে মেরিটের রেকগনিশন নেই বললে সকলেই নিজের তরফ থেকে কথাটা সমর্থন করে।

স্যুট-পরা যে লোকটি বরাবর সামনে চেয়ে খট্-খট্ ছিল ঠুকে বেরিয়ে গেলেন, বেয়ারার কাছ থেকে জানা গেল তিনিই ম্যানেজার। জরুরী-কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বাকি বাবুদের আবার কাল এগারোটায় আসবার হুকুম হয়েছে।

ছুটো বাজে। রণেশের মেজাজ রীতিমতো তিক্ত হয়ে উঠলো। তোড়জোড ক'রে আসা কি সহজ কথা! আজ হেঁটে ফিরতে হবে। রাগের কথা ব'লে ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রে লাভ নেই—কাগজটা বগলে চেপে রণেশ উঠে দাঁড়ালো।

যুবক প্রশ্ন করলো, আপনিও ক্যানডিডেট ?

—হুঁ, ব'লে রণেশ তার মেরিটের রেকগনিশন দিল।

রাস্তায় নেবে রণেশ দাঁড়ালো। গলাটা শুকিয়ে গেছে। সামনেই হিন্দুস্থানী পানের দোকান, বাকি পয়সার অর্ধেক খরচ ক'রে একটা পান কিনলো। পেছন দিয়ে গলা-খয়ের চুঁইয়ে পড়ছে, পরিচ্ছদ বাঁচাতে গলাটা বাড়িয়ে দিতে হয়—

ক্রমান্বয়ে এভাবে হিন্দুস্থানী দোকানের পান খেলে ডারুইনের থিওরি অনুযায়ী গলাটা না জিরাফের মতো লম্বা হয়ে যায়। রোদে হাঁটার কষ্ট কিছুটা লাঘব করার পক্ষে মুখে একটা পান পুরে দেওয়া মন্দ নয়। রাস্তাটা অসম্ভব গরম হয়েছে, পায়ে ফোস্কা পড়বে নিশ্চয়। অবশ্য পশ্চিম দিককার ফুটপাথে ছায়াটা এখন ক্রমেই বাড়বে।

চাকরিটা তেমন সুবিধের হবে ব'লে মনে হয় না। তবু কেরানীগিরির চেয়ে ভালো। জীবনের মূল্য নির্ধারিত হয়ে গেলে আর রইলো কি। নিজেকে বাতিল ক'রে ভবিষ্যতের চিত্র আঁকতে হয় সন্তানকে অবলম্বন ক'রে। চাকরিটা পেলে ভালোই। এরই মধ্যে কত সম্ভাবনা রয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হলে সবই সম্ভব—from insurance agency to ministry। রোগ হবে ব্লাড-প্রেসর, মৃত্যু হবে বাথরুমে। অনিলার সেই আধুনিক বাথরুম। পঞ্চাশ টাকা বেতন শুনলে অনিলাদের বাড়ি থেকে ছুটে আসবে নিশ্চয়ই। কলকাতায় কিন্তু বেশ—বরের আগে টোপর পরানো হয় বাড়ির মাথায়—বাসর রাত্রিটা সকলের জীবনেই হয়তো একটা স্মরণীয় দিন।

পথ চলার বিস্বাদে চিন্তার চাট্নি—তবু অনেক দূর চ'লে পা যেন ভেঙে আসে। একটু জিরিয়ে নিতে রণেশ একটা পার্কে ঢুকলো। দরিদ্র ভদ্রলোক যারা হাঁড়ির খবরের ভয় রাখে, কলকাতা তাদের পক্ষে চমৎকার স্থান। পার্কে ব'সেই দিনকে-দিন রাতকে-রাত কাটিয়ে দাও।—

একটু বিশ্রামের পর আবার চলার পালা। বিশ্রামের আয়েসে পা দুটোকে যেন অকর্মণ্য ক'রে ফেলেছে, টেনে চলা কিছুক্ষণ অসম্ভব মনে হয়। গাড়িওয়ালা কোনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলে বাঁচা যেত। কলকাতায় গাড়ি কেনা কি-ই বা এমন ব্যাপার। পাঁচ-সাত শো হলেই গাড়ি মেলে। অনিলা বেশ 'টম বয়' টাইপের, সুযোগ পেলে ড্রাইভিং অনায়াসেই শিখতে পারবে—

হেছুয়া—সুদীর্ঘ পথটা কি ভাবে কেমন ক'রে যেন কেটে গেল।

জীবনটাও বুঝি বা এভাবেই কেটে যায়।

হংস

এ বাড়িটায় আমি নবাগত।

কলকাতায় মনের মতো একটি বাড়ি পাওয়া সুকঠিন। মনের মতো বলতে বাড়ির আঙ্গিক গঠন বা আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার চেয়ে আমি বেশি জোর দিচ্ছি তার পারিপার্শ্বিকের ওপর। নাগরিক কোলাহল বা ট্রাম-বাসের ঘরঘরানির হাত যদিই বা এড়ানো যায়, অসংখ্য গ্রামোফোন আর রেডিওর অসহ্য রস-চর্চা থেকে কান দুটাকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। যেটা ছেড়ে এলাম তাতে জুটেছিলো আর এক নতুন উপসর্গ। ঠিক আমার ওপরের ফ্ল্যাটে থাকতো এক মদ্র পরিবার। রাত দশটার পর মিনিট দশ-পনের হামানদিস্তায় কি ঠুকতো ওরাই জানে, কিন্তু মাথার ওপরকার সেই ঢুব-ঢুব-ঘটাঙ-ঠং-এর জ্বালায় এক মাসের মধ্যেই ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হলো।

এ বাড়িটি মোটামুটি ভালো ব লেই মনে হচ্ছে। যান্ত্রিক কোলাহল নেই, সুরচর্চা বিরল, এমন কি আশেপাশের মেয়েরাও গান গায় কম ও কদাচিৎ। এ-বাড়ি সে-বাড়ির আধুনিক গানের হা-হুতাশে হাঁপিয়ে উঠতে হয় না। আমার মাথার ওপর এবং পায়ের তলায় কারা থাকেন জানিনে। যাঁরাই হোন লোক ভালো, কোনো হৈ চৈ হল্লা নেই।

ত ম সা

মস্তিষ্কের কাজ করতে হলে নীরবতা সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে উপায় নেই। রাত জেগে পড়া বা লেখা অনেক কেলে অভ্যাস, আংশিক উপজীবিকাও বটে।

কয়েক দিন হলো জরুরী একটা লেখার তাগিদ মাথায় ঝুলছে, করি-করছি ক'রে সময়টা পার হয়ে গেল। কাল না দিলেই নয়। মনে মনে খুবই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সান্ধ্য বৈঠকে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও বাড়ি এসে যখন ঢুকলাম রাত তখন দশটা বেজে গেছে। আহারাদি সেরে কাগজকলম নিয়ে বসলাম, তখনও কে জানতো যে আজ আমার ভালো বাড়ির ভালোত্বে একটা ছেদ পড়বে।

লেখা কতক দূর এগিয়েছে,—শুধু তাই নয়, বিষয়বস্তুটা মনের মধ্যে এমন একটা পরিচ্ছন্ন রূপ নিয়েছে যে গড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারবো মনে করে বেশ আনন্দ হচ্ছে, এমন সময় ওপরতলা থেকে একটা শব্দ সুরু হলো—বিড়বিড় ক'রে কে যেন কি পড়ছে।

চিন্তা স্রোতে বাধা পড়লো। সমাপ্তির আশায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে লাগলাম—বিদ্যাভ্যাস শেষ হোক তারপর শান্তিতে দ্রুত চালে চলা যাবে। কিন্তু শেষ হওয়া দূরের কথা বারোটার পর থেকে সুরু হলো আর এক নতুন উৎপাত। খস্-খস্ একটা ঘষা আওয়াজ ঠিক আমার মাথার ওপরকার মেঝেয়, তার সঙ্গে সেই বিড়বিড়। স্যাণ্ডেল ঘ'ষে পাইচারি ক'রে পড়া হচ্ছে, পাইচারিটা ঘুমের প্রতিষেধক নিশ্চয়ই।

হুঁস

ভয়ানক একটা অস্বস্তি নিয়ে কলম উল্টে ব'সে রইলাম। মধ্য রাত্রির স্তব্ধতায় একটানা এই খস্-খস্ খস্-খস্ আর বিড়বিড় স্নায়ুতে যেন বিষ ঢেলে দিতে লাগলো। ক্রমে অসোয়াস্তিটা রাগ ও ত্যক্ততায় মিশে একটা অসহ্য অনুভূতি নিয়ে সর্ব্বদেহে ছড়িয়ে পড়লো।

লেখা তো দূরের কথা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। ক্রোধের প্রকাশ হিসেবে কাজ বন্ধ রেখে উঠে পড়ার মতো প্রতিবাদ একটার পর একটা ক'রে গেলেও উৎপাতের কোনো প্রতিকার হবে না সে-ও জানি। কিন্তু কি-ই বা করা যায়? একবার ইচ্ছে হলো সরাসরি ওপরে গিয়ে বলে আসতে, কিন্তু এত রাতে হাঁকডাক ক'রে দরবারটাও সমীচীন মনে হলো না। নিরুপায় হয়ে ঘরে বসেই ছটফট করতে লাগলাম। এ দেশের লোকের 'সিভিক সেন্স'-এর অপরিমিত অভাব সম্পর্কে মনটা অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলো; ঝোঁড়ে একটা প্রবন্ধ লেখবার সংকল্প এসে গেল মনে।

হঠাৎ শব্দটা থামলো। হাঁপ ছেড়ে গিয়ে চেয়ারে বসলাম। লেখাটা রাতের মধ্যেই শেষ করা চাই। কাগজ বেরুবার আর কয়েকটা দিন বাকি, কাল সকালে না দিতে পারলে রীতিমতো অপদস্থ হবার কথা। ঠাণ্ডা হয়ে মনটাকে একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছি ঠিক এমনি সময় আবার সুরু হলো সেই খস্ খস্— সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় পড়ার শব্দ। মাঝের ছেদটা সমাপ্তি নয়, সাময়িক বিশ্রাম।

রাত্রির নীরবতায় দ্বিবিধ শব্দের এই একঘেয়ে মিলন সব রকম মনোযোগের মুখ জুড়ে যেন গরাদের দরজার মতো দাঁড়িয়ে গেল—তার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি যদিও বা কিছুদূর চালানো যায়, মনকে চিন্তার বিস্তৃত পরিসরে মুক্ত করা চলে না। বিশেষ ক'রে বিড়বিড় শব্দটা মনযোগের চেষ্টাকে যেন খোঁচা মেরে মেরে মনের গর্তে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলো। ক্রমে সর্বাঙ্গের সমস্ত রাগ ও তাক্ততা মাথায় চ'ড়ে গেল। হাতের কাছে লম্বা একটা লাঠি পেলে ছাদ-টাকে হয়তো বা বেদম জোরে ঠুকে দিতাম। আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগলাম। লেখা তো চুলোয় যাক সহ্য করাই অসম্ভব হয়ে উঠলো। ঘুমের চেষ্টা করাও বৃথা—এই মেজাজ, অসমাপ্ত কর্তব্যের অসোয়াস্তি, তার উপর এই শব্দ।

শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থী যে-ই হোক, সে এবং তার অভিভাবককে কাল সকালে উঠেই 'সিভিক সেন্স' সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ ভদ্র ভাষায় কি ব'লে অপদস্থ ক'রে দেওয়া যায় মনে মনে তারই একটা মুসাবিদা করতে লাগলাম।

প্রায় তিনটে নাগাদ শব্দও থামলো, ক্লান্ত তিক্ত দেহ-মন নিয়ে আমিও বিছানায় গা ছড়িয়ে দিলাম।

সকালে আচমকা একটা পড়ার আওয়াজে বিছানায় উঠে বসলাম। নিদারুণ পড়িয়ে, এরই মধ্যে উঠে মুক্ত কণ্ঠে সুরু ক'রে দিয়েছে।

তড়াক ক'রে উঠে পড়লাম। এক্ষুণি গিয়ে আচ্ছা রকম সমঝিয়ে দিয়ে আসবো।

হুঁস

তেতলার সিঁড়িতে পা দিয়েছি পেছন থেকে ডাক শুনলাম, 'শুনছেন মশাই, দেখুন—'

ঘুরে দাঁড়ালাম। 'কাকে বলছেন, আমাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা একতলায় থাকি ব'লে কি আর মানুষ নই—সারা রাত মাথার উপর খট্-খট্ খট্-খট্ করলে লোকে ঘুমোয় কি ক'রে বলুন তো? আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকের এটুকু খেয়াল থাকা উচিত।'

চকিতে দৃষ্টিটা নিজের পায়ের উপর দিয়ে একবার ঘুরে এল। স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেছে, পরিবর্তে পুরোনো 'নিউকাট'-টাই চলছে—সেটা নিয়েই কাল সারারাত ঘরে ছটফট ক'রে বেড়িয়েছি।

ত্রুটি স্বীকার ক'রে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম, অন্তত তখনকার জন্যে আর তেতলায় যাওয়া হলো না।

লাল মাটি

খুবই সাধারণ একটা বোর্ডিং-হাউসে কিছু দিনের জন্মে থাকতে হয়েছিলো—সেখানকারই হু'চারটে ঘটনা। যাকে কেন্দ্র ক'রে ঘটেছিলো সে লোকটি আজও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে।

বোর্ডিংএ যেদিন প্রথম ঢুকলাম, ম্যানেজর তাঁর সবচেয়ে ভালো ঘরখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন দোতলায়। দেখে নেহাৎ অপছন্দ হলো না। দক্ষিণে বড় বড় হুটো জানালা, যদিও সেখান দিয়ে তেমন হাওয়া খেলবে আশা করা গেল না—হু'টোরই সামনে জুড়ে রয়েছে একটা তেতলা বাড়ি। তবে কিনা পুব দিকের খোলামেলা ভাব দেখে আশা হলো। ঘরে আসবাব বলতে তক্তাপোশ, চেয়ার, টেবিল আর একটি আলনা।

ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে মনে হলো উপস্থিত যিনি এখানে আছেন সৌন্দর্যচর্চা তিনি মোটেই করেন না, কিন্তু স্বাস্থ্যচর্চা করেন প্রচুর। এক কোণে গা-ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আছে বিপুলদেহী হুই গদা। এ হুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যার চতুর্দিকে ঘুরপাক খায়,সে-দেহের পরিমাপ এবং পুষ্টি সম্বন্ধেও বেশ কিছুটা আঁচ করা যায়। টেবিলে কলাই করা ডিসে কিছু ছোলা ভেজানো প'ড়ে আছে, আলনায় হু'খানা কাপড় আর একটি

পাঞ্জাবি, বিছানা বলতে শুধু পাটিতে অতি মলিন একটা বালিস, সব কিছুতেই লালমাটির দাগ। বোঝা গেল, ভদ্রলোক যে-ই হোন আমাদের মতো চুলের ডগা থেকে পায়ের তলা অবধি মাটির বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করেননি।

'এখানে তো কে যেন থাকেন দেখছি?' ম্যানেজরকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ওঁর ব্যবস্থা আমি কালকের মধ্যেই অন্যত্র ক'রে দেব। শুধু আজকের দিন আর রাতটার জন্যে অনুগ্রহ ক'রে মাপ করতে হবে।' ম্যানেজর সবিনয়ে জানালেন।

মাপ করতে সম্মত হয়ে চেয়ার টেনে বসলাম।

ম্যানেজরবাবু তাঁর বাবু-কোঁচাকে বামুন-কোঁচা ক'রে নিজেই কাজে লেগে গেলেন। বালিস সমেত পাটিটাকে টেনে নিয়ে এক কোণে দেয়ালের গা ঘেঁষে বিছিয়ে দিলেন। জামাকাপড়গুলোকে হাত বাঁচিয়ে ধরার ভঙ্গিতে আলনা থেকে নিয়ে পাটির ওপর ফেলে রেখে বললেন, 'কি নোংরাই থাকেন বীরেনবাবু! এই সেদিন অবনীবাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বোর্ডিং ছেড়ে চ'লে গেলেন। যাবার সময় বললেন, চললাম কালীবাবু আপনার এখান থেকে, যত সব ছোটলোক এনে জুটিয়েছেন। কত ডাকলুম, জবাবই দিলে না—' জুতোর শব্দ পেয়ে কালীবাবু থেমে পড়লেন, কে একজন বারান্দা দিয়ে চ'লে গেল—তিনি ফের সুরু করলেন, 'মশাই গতকাল এসে বলেন কিনা, কালীবাবু টাকা ফুরিয়ে

গেছে, থাকবো, খাবো, টাকা এলেই বাড়ি চলে যাবো—আর ভালো লাগছে না এখানে। কি করি বলুন, 'না' বলতে পারিনে। ছেলেটার অসুখের সময় কি করাটাই না করেছেন, বলতে গেলে ওঁরই জন্যে এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছে। বিপদে পড়লে লোক চেনা যায় মশাই, দিনুবাবুর কাছে বিশটা টাকা অগ্রিম চাইলুম—' সুর বদলে বললেন, 'ধারও বলতে পারেন—তা মুখ ফিরিয়ে রইলো, হ্যাঁ না একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না! এই তো শুনলুম চাকরি নিয়ে কি নাকি গণ্ডগোল বেঁধেছে, এখন দেখা যাবে—ভগবান কি আর নেই!' এই ঘটনা দ্বারা যাঁর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেল বোধ হয় তাঁরই উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে আবার ব'লে চললেন, 'এই ঘরের ভাড়া বেশি, তাই মেম্বর জোটে কম, মাঝে-মাঝে এমনি খালি পড়ে থাকে; তাই ভাবলুম যে কদিন লোক না আসে থাকুন উনি এখানে। তা আপনি কিছু ভাববেন না, কালকের মধ্যে আমি ব্যবস্থা একটা করে ফেলবো।'

এ যাবৎ দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, হঠাৎ ফুঁ দিয়ে চৌকির কোণটা ঝেড়ে ব'সে পড়লেন। আয়োজন ক'রে ব'সে বলবার মতো তাঁর আরও অনেক কিছু আছে ভেবে অস্বস্তি বোধ করলাম। এতটুকুতেই বুঝেছিলাম কালীবাবু সেই জাতের লোক যারা কথা বলবার জন্যে নতুন লোক পেলে উল্লসিত হয়ে ওঠে, এবং শ্রোতার আগ্রহ বা অনিচ্ছার ধার না ধেরে নিজের ঝোঁকে কথা ব'লে চলে। তিনি বলতে লাগলেন, বীরেনবাবু নাকি লোক

অতি ভালো, তবে কিনা মেজাজটা একটু খারাপ, এক-এক সময় কারণে-অকারণে খপ ক'রে ভয়ানক চ'টে যান, ইত্যাদি।

নিষ্প্রয়োজনে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের মেজাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবৃতি শোনার মতো মেজাজ তখন আমার ছিল না। বললাম, 'চাকরটাকে পাঠিয়ে দিন, ঘর সাফ ক'রে বিছানাপত্র ঠিক ক'রে দিয়ে যাক।'

'এই এক্ষুণি পাঠাচ্ছি।' ব'লে, যেতে যেতে কালীবাবু জানিয়ে গেলেন, বীরেনবাবুকে তিনি বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলবেন যাতে একদিনের মধ্যেই আবার আমার সঙ্গে একটা রাগারাগি না ক'রে বসেন।

ভৃত্য এসে তার কর্তব্য সেরে চলে গেল।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম তখন সবে ন'টা বেজেছে। কয়েকখানা জরুরী চিঠি লিখবার ছিল—চেয়ার টেনে টেবিলের ওপর ঝুঁকে চিঠি লিখতে ব'সে গেলাম।

একখানা চিঠির খানিকটা লিখেছি এমন সময় পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখলাম বই হাতে নিয়ে এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। পরিচয় না নিয়েই চিনলাম ইনিই ম্যানেজারবাবু বর্ণিত 'মানুষ ভালো, মেজাজ খারাপ' বীরেনবাবু। ঘরে ঢুকে আমার সম্পর্কে কোনো কৌতূহলই তিনি প্রকাশ করলেন না। বোধহয় পূর্বেই জেনে এসেছেন, ব্যবস্থার পরিবর্তনটাও বেশ সহজভাবে মেনে নিলেন বলেই মনে হলো। কারণ পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম তিনি শুয়ে পড়লেন। একটু

পরেই বইয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দ আর গুণ-গুণ গানের সুর—ক্রমে সেই সুর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হলো, 'আমার মাথা নত ক'রে দাওহে তোমার—' ইত্যাদি। বড়ই কৌতুক বোধ করলাম। চিঠি লেখা বন্ধ ক'রে ব'সে রইলাম। গানটা তিনি বহুবার শুনছেন নিশ্চয়ই, তাই মাঝে মাঝে প্রচলিত সুরের রেশ বিকৃতভাবে এসে তাঁর সুরদানের মৌলিকত্বে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিলো।

চিৎ হয়ে শুয়ে এক হাতে গীতাঞ্জলি নিয়ে অন্য হাতে মেঝেয় তাল ঠুকছেন আর একের পর এক পাতা উল্টে গেয়ে চলেছেন। গাইতে গাইতে হঠাৎ থামলেন, বোধ হয় খেয়াল হলো হাতের বাদ্যটা ঠিক আওয়াজ দিচ্ছে না, মুখে ব'লে উঠলেন, 'টাক্ টাক্ ডুম্ ত্রাক্—'

তবলের আওয়াজ শুনে হাসির আওয়াজটা চাপতে পারলাম না, নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে পড়লো।

'আপনি বুঝি আমার গান শুনে হাসছেন!' বীরেনবাবু বললেন। 'সুর বোধহয় সবটার ঠিক হয় না।'

একটা 'বোধহয়' যখন বলেছেন একেবারে সুরজ্ঞান শূন্য ভাবতে পারলাম না।

আমার তরফ থেকে কোনো উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এ ঘর নিলেন? কদ্দিন থাকবেন এখানে?'

উত্তরে জানালুম, বিশেষ একটা কাজে কলকাতায় এসেছি, দু-তিন মাসের বেশি থাকবার প্রয়োজন সম্ভবত হবে না। এর পর আমার নাম আর বাড়ি কোথায় বলা শেষ হওয়া মাত্র 'আচ্ছা

আপনি চিঠি লিখুন।' ব'লে এমনভাবে বেরিয়ে গেলেন, মনে হলো এমন যার নাম এবং অমন স্থানে যার বাড়ি অধিকক্ষণ ব'সে অধিক কথা তার সঙ্গে তিনি বলতে চান না।

এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল ফিরতে একটু রাত হলো। এসে দেখি অদ্ভুত এক মশারি ততোধিক অদ্ভুতভাবে খাটিয়ে তিনি শুয়ে আছেন। সকালে যে-পাঞ্জাবিটা আলনায় দেখে-ছিলাম, দড়ির অভাবে সেটা এক হাতে মশারির কোণ আর অন্য হাতে জানালার শিক ধ'রে ট্র্যাফিক-পুলিশের মতো প্রসারিত হস্ত নিয়ে এক পাশে ঝুলছে। কুস্তির সময় সভ্যতার শেষ-চিহ্ন স্বরূপ যেটি তাঁর অঙ্গে টিকে থাকে অন্য একটি টানা বোধ হয় সেই বস্তুটির সাহায্যেই দেওয়া হয়েছে। দেখে হাসি পেল। যা এত আয়োজন ক'রে খাটানো হয়েছে তার প্রয়োজন সম্পর্কে লোকটি কতই না উদাসীন! কারণ ওটাকে মশার অরি না ব'লে নিঃসন্দেহে মশার বন্ধু বা বাড়ি বলা চলে।

শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই ঘোষিত হলো তিনি নিদ্রিত। সেই ঘোষণার নির্ঘোষে আমার ঘুমের কিন্তু বিষম ব্যাঘাত হতে লাগলো। একটু নড়তে গেলে তক্তাপোশটা আর্তনাদ ক'রে ওঠে, অত্যন্ত গরম, তার ওপর ঐ নাসিকা গর্জন, সারাটা রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে শেষরাত্রির দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সবে মাত্র প্রাতরাশ সেরে বেরুবো মনে করছি, বীরেনবাবু এসে কুশল প্রশ্ন করলেন। উত্তরে জানালুম, 'গত রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না।'

'যা গরম—' বিস্তৃত বক্ষে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বীরেনবাবু বললেন। 'আমারও মোটেই ঘুম হয়নি।'

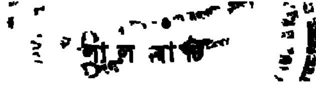
'আপনার না হলে আমার হতো বোধ হয়।' একটু হেসে বললাম।

কথাটা ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। মেজাজের যে প্রকার ইতিহাস শুনেছি প্রথমটা একটু ভয় হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতুক করার ইচ্ছাটা চাপা গেল না। একটু আভাস দিতেই বুঝলেন। সে কি হাসি! শুনলেই বোঝা যায় এ হাসির মূলে প্রাণের প্রাচুর্য, আমার কৌতুক শুধু একটা উপলক্ষ মাত্র।

হাসিটা হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার ঘুম বুঝি খুব হালকা, কোনো শব্দ হলে ঘুমোতে পারেন না?'

'তা আর বলি কি ক'রে। আসবার সময় ট্রেনে তো বেশ ঘুমিয়েছি। যে-কোনো শব্দই হোক একটা সমতা রেখে চললে কানে সেটা স'য়ে আসে।'

বীরেনবাবু অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হলেন। তাঁর জন্যে আমার ঘুম হবে না, এ হতেই পারে না। আজই তো এখান থেকে চ'লে যাচ্ছেন, একান্ত যদি যাওয়া না-ই হয়, সারা রাত্তি ব'সে কাটাবেন তবু আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবেন না। বেশ বোঝা গেল কথাগুলো বলতে হবে ব'লেই বললেন না। দু'-একটি কথার ভেতর দিয়ে লোকটির সহজ সরল ভাব সোজা



এসে মনকে স্পর্শ করে। তাঁকে বললাম, এ কারণে তিনি এখান থেকে চ'লে গেলে সত্যি আমি বিশেষ দুঃখিত হবো।

এক সপ্তাহ পরের কথা। বীরেনবাবু এখন আমার বীরেনদা হয়েছে। আজ কাল ক'রে নানা অসুবিধায় স্থানান্তরে যাওয়া তার হয়ে ওঠেনি। আমিও আপত্তি করা দূরের কথা বরং থাকতে অনুরোধই করেছি। সম্পূর্ণ একটা পুরুষালী স্বভাবের সাহচর্য মনে যেন বেশ একটি নিশ্চিন্ততা আনে।

এক-এক জন লোক আছে যাদের হঠাৎ কেন অতি পরিচয়েও 'তুমি' বলতে বাধে। নিজেকে আমি সেই পর্যায়েরই মনে করতাম। কিন্তু বীরেনদা যেদিন বিনানুমতিতে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলতে সুরু করলো, প্রথমটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকছিলো বটে, অসঙ্গত ব'লে মনে করতে পারিনি।

বীরেনদার কথা শুনে মনে হয় তাদের আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়। হোমিওপ্যাথি শিক্ষা উপলক্ষ ক'রে এখানে আছে। রোগ না ধরতে পারলেও রোগী ধরবার চেষ্টাটা তার মধ্যে প্রবল, ইতিমধ্যে আমাকেও হানিমান্-এর দু'এক ফোটা গেলানোর চেষ্টায় ত্রুটি রাখেনি। হানিমান্-এর নামের উল্লেখমাত্র জোড়হস্তে নমস্কার জানায়। হানিমান্-এর একখানা বড়ো ছবিও দেখেছি তার কাছে। বাঁধিয়ে রাখবে ব'লেই এনেছিলো কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। অধুনা ভাঙাচোরা মলিন অবস্থায় বইয়ের এ-কাঁক

থেকে সে-ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়। বীরেনদা এখনও এটিকে বাঁধানোর বাসনা রাখে। আঙুলের টিপে চোখের সামনে ঝুলিয়ে সেদিনও আলোচনা করেছে, কি ফ্রেম দিলে মানাবে ভালো।

একদিন বোর্ডিং-এ ফিরে দেখি বীরেনদা মহামনোযোগের সঙ্গে একটার পর একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাচ্ছে।

'এ কি হচ্ছে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'পয়সা পয়সা দাম, নিয়ে এলাম গোটা চারপাঁচ—ফস্ ফস্ জ্বালাতে বেশ লাগে।' অত্যন্ত সহজভাবে বীরেনদা উত্তর দিল।

ভাবলাম, এত স্বল্প খরচায় বেশ লাগার ব্যবস্থা করতে পারলে জীবনের অনেক নালিশ ঘুচে যেত। সেদিক দিয়ে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করা ছাড়া উপায় নেই।

'যাবে? এই সামনের হাউসে ভালো একটা ছবি হচ্ছে।'

'না।' সংক্ষেপে বীরেনদা জানালো।

আমার জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে, হাতের কাছেই যার ভালো লাগার ব্যবস্থা রয়েছে সে বাইরে যাবে কেন। আর কোনো কথা না ব'লে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ছবি শেষ হবার আগে থেকেই জোর বৃষ্টি নেমেছে, বোর্ডিংএ ফেরা নিয়ে ভাবনা হলো। বাইরের বারান্দায় এসে দেখি দুই বগলে দুই ছাতা নিয়ে বীরেনদা দাঁড়িয়ে আছে।

'একি! তুমি এখানে?'

'জানি ছাতা সঙ্গে আনোনি—চলো।'

পরের দিন সকালে বীরেনদাকে জানালাম, একা একা ঘুরতে

ভালো লাগে না, সে সঙ্গে গেলে সন্তুষ্ট হবো। বীরেনদাও আপত্তি করলো না।

পদযুগলের সহজপ্রবেশের জন্যেই হয়তো ক্যানভাসের জুতো জোড়ার গোড়ার দিকটা মুড়ে নেওয়া হয়েছে, চটির মতো চট্‌পট্‌ সেটায় পা ঢুকিয়ে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে সে বেরিয়ে-পড়লো। ফেরবার পথে বীরেনদাকে সঙ্গে নিয়েই গেলাম মাসীমার বাড়ি, উদ্দেশ্য দেখাসাক্ষাতের কর্তব্যটা সেরে যাওয়া। বাড়ির সবাই এসে জুটলো বাইরের ঘরে। ভাই বোন সকলের সঙ্গেই বীরেনদার পরিচয় করিয়ে দিলাম। মেয়েদের সামনে প'ড়ে বীরেনদার মতো অত বড়ো মানুষটা যেন এতটুকু হয়ে গেল।

মাসীমা দুজনকেই বললেন খাওয়াদাওয়াটা সেখান থেকে সেরে যেতে। জুবুথুবু অবস্থায় ব'সে থেকে বীরেনদা হাঁপিয়ে উঠেছিলো, চুপিচুপি জানালো, সে থাকতে পারবে না, এখনি চলে যাবে। বেচারার অবস্থা দেখে আমারও করুণা হলো—মাসীমাকে বুঝিয়ে বললাম, গোঁ যখন চেপেছে ওকে রাখা যাবে না। বীরেনদাকে বিদায় দিয়ে আমি রয়ে গেলাম।

বিকেলের দিকে বোর্ডিংএর দরজায় পা দিয়েই বুঝলাম ভেতরে ভয়ানক একটা চটাচটি আর গণ্ডগোল চলছে। শঙ্কিত মনে ওপরে উঠলাম। যা আশঙ্কা করেছি তাই, বীরেনদাই প্রধান ভূমিকা অভিনয় করছে। ছাতে ওঠার দরজাটার উভয় ওষ্ঠ যুক্ত ক'রে মস্ত একটা তালা ঝুলানো আর তারই সামনে বীরেনদা

একটা কাঠের রুল হাতে বীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা ব্যবধান বাঁচিয়ে অন্যান্য মেম্বররা কোলাহল করছে। যুবকদের তড়পানির সঙ্গে বয়স্কদের বকবকানি মিশে বেধে গেছে মহা এক হট্টগোল। বীরেনদা কিন্তু মুখে কিছুই বলছে না।

আমাকে দেখামাত্র মেম্বরদের মধ্যে থেকে জনকয় এমন ভাব নিয়ে এগিয়ে এল যেন মীমাংসাটা আমার জন্যেই স্থগিত রয়েছে, না হয় এতক্ষণে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত।

একজন বলে উঠলো, 'এখনো সামলান আপনার বীরেনদাকে, না হয় ফলটা ভালো দাঁড়াবে না বলে দিচ্ছি।'

বীরেনদাকে সামলানো দরকার সেটা আমারও মনে হয়েছে। না সামলালে মন্দ সামাল দেওয়াটা কোন তরফের চুক্কর হবে আমার অজানা ছিল না। বীরেনদার ভাব দেখে কিন্তু মনে হলো এ সব কথা তার কানেই যাচ্ছে না। এমনকি যে লোকটি এত তর্জন করছে তার দিকে একবার সে চেয়েও দেখছে না; তার আড়ালে যে সুশ্রী যুবকটি দাঁড়ানো, বীরেনদার শান্ত কঠোর দৃষ্টি স্থির হয়ে ছিল তার ওপরে।

বীরেনদার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি—ওখানে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

উত্তর দিল সেই লোকটি। 'দেখুন না মশাই কি অন্যায়, পাশের বাড়ির মাতালটা ওকে নাকি বলেছে আমাদের ছাত থেকে ঐ ছাতে কে চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছে। শুনে এসে আমাদের



বললেই হতো, না, বলা নেই কওয়া নেই তিনি এসে ছাতের সিঁড়িতে এক তালা লট্‌কে দিলেন—'

'তালা দেওয়া মানে বোর্ডিং শুদ্ধ সবাইকে ইন্‌সল্‌ট করা।' একটি যুবক ব'লে ওঠে। 'তা, খুলতে গেছি ঐ দাঁড়িয়েছে দেখুন না—বলে, এস কে খুলবে।'

যে লোকটি বেশি তর্জন করছিলো সে আরো গলা চড়িয়ে দিলো। 'বেটা মাতাল, রাতদিন বেশ্যাবাড়ি পড়ে থাকে, ওর কথায় আবার বিশ্বাস—চিঠি পেয়েছে তো করুক না প্রমাণ কে ছুঁড়েছে।'

এদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা নিরর্থক। বীরেনদাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম।

'খুলতেই হবে—যা গরম,আদ্ধেক লোক আমরা ছাতে শুই।' কে একজন বললো পেছন থেকে।

জোর গলায় বলাবলি চলতে লাগলো। ম্যানেজর উপস্থিত নেই, ফিরলেই নাকি একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে। এমন লোককে না তাড়ালে সবাই তারা এ বোর্ডিং ছেড়ে দেবে।

গায়ের জোরে পাড়াপড়শীর নৈতিক চরিত্রের অভিভাবক হয়ে দাঁড়ানোটা আমার নিজের কাছেও ভালো মনে হয় না। এ সকল ব্যাপারে যাওয়ার জন্যে যতটুকু মন্দ বলা উচিত বললাম। বীরেনদা কোনো কথারই কোনো উত্তর দিল না, চুপচাপ এসে যেমন ব'সে ছিল তেমনি ব'সে রইলো।

বললাম, 'তালাটা খুলে দিয়ে এস, ওরা সবাই ছাতে শোবে বলছে—'

'তখন খুলে দেওয়া যাবে। দিনে ওটা বন্ধই থাকবে।' বীরেনদা জোরের সঙ্গে বললো। 'তুমি জান না, ঐ যে সুন্দর মতো ছোকরা, ব্রজেশ, চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল—মিটুকে শয়তান, দিনের মধ্যে দশবার ছাতে যাওয়া আসা করে, আমি নিজে দেখেছি। বেশি বাড়াবাড়ি করবে তো এক-একখানা ক'রে হাড় ভেঙে দেবো।'

এখন বিশেষ ঘাঁটানো উচিত হবে না বুঝে চুপ ক'রে গেলাম।

ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দু'জনেই চুপচাপ ব'সে আছি। হঠাৎ বীরেনদা বললো, 'চা খেলে না—আনতে বলবো?'

উত্তরে জানালাম, মাসীমার বাড়ি থেকেই ওটা সেরে এসেছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, সবাইকে ছেড়ে ও-বাড়ির লোকটি তোমার কাছে নালিশ জানাতে এল কেন?'

'মুখচেনা আছে, বোধ হয় তাই। মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দেয়, কখনো এসে বলে, হাত খালি, বড়ো বিপদে পড়েছি,নয়তো বৌএর অসুখ—দিয়ে দিই যা পারি। বলে ধার, কিন্তু শোধ আর দেয় না।'

কথা শুনে বীরেনদাকে আর নিছক নীতিরক্ষক মনে করতে পারলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ কাটলো অন্ধকারে চুপচাপ।

পাশের বাড়ি থেকে আচমকা একটা নারীকণ্ঠের চিৎকার কানে এসে পৌঁছলো। তিন-চার হাত মাত্র ব্যবধান—ব্যাপার কি বুঝবার জন্তে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বোঝা গেল স্বামী তার নিজের চরিত্রচর্চাটা স্থগিত রেখে স্ত্রীর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করছে। আঘাতের শব্দগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—সঙ্গে স্ত্রীর চাপা কাতরোক্তি, 'ওগো আর যাব না, এবারটি মাপ করো—মাগো, মেরে ফেললো গো—'

ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে লোকটার টুঁটি চেপে ধরি।

বৌটিকে দিনের মধ্যে অনেকবারই দেখতে পাই জানালার সামনে দিয়ে চলাফেরা করছে। পাতলা লম্বা শরীর, মুখখানা স্থন্দরই বলা চলে কিন্তু তা যেন আলগা একটা বিষণ্ণতার তলায় চাপা পড়ে আছে। মানুষটিকে চোখে দেখেছি বলেই দুঃখটা যেন একটু বেশি বোধ করলাম—রাগও হলো খুবই।

হঠাৎ লোকটা নিজেই চিৎকার করতে করতে নিচে নেমে গেল—বাড়িময় একটা বিরাট গণ্ডগোল, স্ত্রী পুরুষের চেঁচামেচি। বুঝতে পারলাম না কি হলো।

খানিকক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। গণ্ডগোলটা স'রে গেল রাস্তার দিকে।

কে একজন পেছন থেকে বললো, 'যান না, আপনার বীরেন-দাকে যে পুলিশে দিচ্ছে—'

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বাতিটা জ্বাললাম—সত্যি বীরেনদা তো ঘরে নেই !

দেরি না ক'রে ছুটে গেলাম রাস্তায়। গিয়ে দেখি বহু লোক বীরেনদাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তার ডান গালের খানিকটা ছ'ড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে। আমাদের বোর্ডিংএরও প্রায় সকলকেই সেখানে দেখা গেল। সবাই কিছু-না-কিছু বলছে, এরই মধ্যে একটি লোক নিজের মাথায় হাত বুলোচ্ছে আর কেবলই চেঁচাচ্ছে 'মাথাটা ঠুকে ঠুকে একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে মশাই, দেখুন না—'

ইনিই হবেন সেই স্বামী দেবতা।

এক ভদ্রলোক ভারিক্কি চালে বললেন, 'ট্রেসপস্ এণ্ড এসল্ট, কেস সিরিয়স—'

বোধ হয় উকিল।

কিছু করা গেল না, কে আমার কথা শুনবে। পরোপকারী লোকের অভাব নেই—কে একজন এরই মধ্যে পুলিশ এনে হাজির করেছে।

বীরেনদার ওপর কারুর সহানুভূতি আছে ব'লে মনে হলো না। বোর্ডিংএর দু'তিন জন মেম্বর তো সঙ্গে থানায় গেল শুধু মজা দেখে আসতে। তাদেরও আক্রোশটা তখন পর্যন্ত টাটকা।

মনটা অতিশয় খারাপ হয়ে গেল। বোর্ডিংএ ফিরে কেবলই মনে হতে লাগলো, অন্যায় অবিচার যে সহ্য করতে শিখলো না সে মানুষের সমাজে বাস করবে কি ক'রে ! অন্যায়ের

বিরুদ্ধে শিরা-উপশিরা যার এভাবে রুখে দাঁড়ায় প্রতিপদে লাঞ্ছনা তার অনিবার্য।

বোর্ডিং-এর বারান্দায় এ নিয়েই আলোচনা চলছে। ছুটো-ছাটা কথা কানে আসতে লাগলো। বুঝলাম, পাশের বাড়ির প্রতি একটা দুর্বলতা এরা বীরেনদার চরিত্রে আরোপ করতে চাচ্ছে। ছাতের সিঁড়িতে তালা দেওয়া, এই মারপিট সবই সেই ঈর্ষা থেকে এটাই তাদের প্রতিপাদ্য।

কথাগুলো শুনে আমারও মনটা খচ্ ক'রে উঠলো। কিন্তু কেমন যেন শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হ'তে চাইলো না। সে যাই হোক, বেশিক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারলাম না। পুরোনো এক বন্ধু পুলিশবিভাগে উচ্চপদস্থ, তাকে গিয়ে ধ'রে পড়লাম, যত সত্বর এবং যেমন ক'রেই হ'ক এর একটা বিহিত করতে হবে। অন্যায়ের দণ্ড দিতে গিয়ে যে অন্যায় হয়েছে তার দণ্ড হিসেবে যথাসম্ভব অর্থ ঢালতে প্রস্তুত, সেটাও জানিয়ে দিলাম।

বন্ধুর ক্ষমতার গুণে একে-ওকে তুষ্ট ক'রে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে বেশি বেগ পেতে হলো না।

হাজতের সামনে গিয়ে দেখি বীরেনদা ভেতরে মহা মনোযোগের সঙ্গে উঠ-বস করছে—জানি এটা তার মন খারাপের প্রতিষেধক।

'এত রাতে আবার এখানে কেন?' আমাকে দেখে প্রক্রিয়াটা বন্ধ রেখে বীরেনদা জিজ্ঞেস করলো।

শেকল শুদ্ধ তালা খোলার শব্দই তার কথার জবাব দিল।

পরের দিন সিঁড়ির তালা খোলা নিয়ে একটা গোলযোগ

কিন্তু চলতেই লাগলো। মেম্বরদেরও এ নিয়ে একটা জেদ দাঁড়িয়ে গেল, বীরেনদাও দিনের বেলায় কিছুতেই দরজা খুলে দিল না। এই অন্যায় গোঁয়ারতুমিতে আমারও মেজাজটা তিক্ত হয়ে উঠলো বীরেনদার ওপর। বললাম, 'দু'চার দিনের ভেতরেই এ বোর্ডিং আমি ছেড়ে যাচ্ছি।'

বীরেনদা বললো সেও তা হলে চলে যাবে।

কালীবাবু এসে ধ'রে পড়লেন বীরেনবাবুকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দরজার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে। মেম্বররা নাকি নোটিশ দিচ্ছে ছেড়ে যাবার। কাজটা হয়তো বীরেনবাবু ভালোর জন্যেই করেছেন, কিন্তু তাঁর যে ব্যবসা। তাঁকে জানিয়ে দিলাম দু'চার দিনের মধ্যে আমরা দু'জনেই এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি, অতএব এ নিয়ে আর ঘাটাঘাটি না করাই ভালো।

পাশের বাড়ির বৌটিকেও আর দেখতে পাই না। এদিককার জানালাগুলো তাদের পাকাপাকি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

একটা ভালো বোর্ডিং বা মেস খুঁজে বা'র করবার জন্যে ঘোরাফেরা শুরু করলাম। বীরেনদাও থাকতো সঙ্গে। আমার সঙ্গে ঘোরাটা এরই মধ্যে তার প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

দিন দুই পরের কথা। নানা কাজ সেরে আমাদের ফিরতে বেশ একটু রাত হলো। বোর্ডিং-এর সামনের গেট বন্ধ হয়ে গেছে। পাশের দরজাটা বেশি রাত অবধি খোলা থাকে, দুই বাড়ির মাঝখানকার গলি দিয়ে তার পথ।

সেই গলিতে ঢুকতেই পাশের বাড়ির খিড়কিতে দাঁড়ানো একটি স্ত্রীলোক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল ভেতরে, আর একটি লোক দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বোর্ডিং-এর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো।

দুটি প্রাণীকেই আমি যখন চিনতে পেরেছি বীরেনদাও চিনেছে নিশ্চয়ই। এর পর কি ফ্যাসাদ বাধাবে কে জানে—সমস্ত মনটা অতিমাত্রায় শঙ্কিত হয়ে উঠলো। ভয় থেকেই এল বিরক্তি। বীরেনদার সঙ্গে নিজেকে এতখানি জড়িয়ে ফেলেছি ব'লে নিজের ওপরই রাগ হতে লাগলো।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালতেই বীরেনদা তার বালিশের তলা থেকে কি একটা নিয়ে বেরুতে যাবে, তার হাত চেপে ধরলাম, '৳ ঘর থেকে এখন তুমি বেরুতে পাবে না—আবার যদি কোনো গোলযোগ বাধাও তো—' আর কি বলবো ভেবে পেলাম না।

তার হাতের কব্জি আমার হাতের মুঠোয় ধরছিলো না। হাতটা সে-ভাবেই রেখে শান্ত কণ্ঠে বীরেনদা বললো, 'হাত ছাড়ো—ভয় নেই, আমি কাউকে কিছু করতে যাচ্ছিনে।'

হাত ছেড়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না, সঙ্গে গেলাম।

বীরেনদা প্রথমেই গিয়ে সিঁড়ির তালাটা খুলে দিল, তারপর গিয়ে দাঁড়ালো ব্রজেশের দরজায়। ভয়ে ব্রজেশের মুখচোখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, তালাচাবিটা তার সামনে ফেলে রেখে বীরেনদা ফিরে এল—

এসে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো তার বিছানায়।

স্পর্শক

কলকাতা। আধুনিক কেতায় সাজানো একটি বসবার ঘর। ঘরের সজ্জা থেকেই বোঝা যায় গৃহস্বামীর অবস্থা সচ্ছল। ঘরের একপাশে স্তূপীকৃত কোরা শাড়ি আর ধুতি। গৃহকর্তা রমেনের বয়স তিরিশ কি বত্রিশ, দীর্ঘ ঋজু দেহ, মুখে চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। কতক শাড়ি এবং ধুতি সে দু'ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে। পাশে দাঁড়ানো সুধীর আর জ্যোৎস্না—সাম্যবাদী তরুণ তরুণী।

রমেন

পনের খানা শাড়ি আর আটাশ খানা ধুতি, গুণে নিয়েছ তো সুধীর, ব্যাস্, এখন চট্‌পট্ রওনা হয়ে পড। চললে যে, শোনো, চাল ওজন ক'রে নিও কিন্তু—আধমণ।

সুধীর

আমি যাচ্ছি জ্যোৎস্নাদি।

জ্যোৎস্না

এস ভাই।

[সুধীর বেরিয়ে গেল]

রমেন

এগুলো আপনার জ্যোৎস্নাদেবী বুঝে নিন—কী কর্তব্যই যে ঘাড়ে চাপিয়েছেন, দিনের অর্ধেক সময় কেটে যায় এর পেছনে—ব্যবসাপত্তর দেখাশোনা বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছি।

জ্যোৎস্না

ঘাড়ে চেপে আছে যদি মনে করেন তো ফিরিয়ে দিন, আমার

ঘাড় পাতাই রয়েছে। অতগুলো ক'রে টাকা দিচ্ছেন সেটাই যে একটা মস্ত দেওয়া—আনন্দ যদি না পান তো সময়টা দেবেন কেন?

রমেন

আনন্দ পাইনে এ-কথা আজ আর বলতে পারিনা জ্যোৎস্না-দেবী, এ কাজেরও একটা নেশা আছে—একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু প্রথম যেদিন অর্থ-সাহায্য চাইতে এসেছিলেন সেদিন এগিয়ে গিয়েছিলাম কিসের আকর্ষণে সে কথা আমি গোপন করিনি—সে কোনো আদর্শের নয়, আদর্শের এই অপরূপ আশ্রয়টির। এ কথা স্বীকার করতে সংকোচ আমার নেই। এটাও সত্যি, এ ক'দিনের মধ্যেই কাজের প্রেরণার সঙ্গে কাজকেও যে কখন সমান ভাবেই ভালবেসে ফেলেছি তা নিজেও জানিনে; কিন্তু পাবার সময় কাজকেই শুধু কাছে পেলাম, প্রেরণার সঙ্গে আজও 'দেবী'র দূরত্ব 'আপনি'র আড়াল।

জ্যোৎস্না

[যথাসম্ভব সহজভাবে] 'তুমি' বললেই জানতে পেতেন বলার পথে কোনো বাধা নেই, 'দেবী'তেই বা দরকার কি?

রমেন

মানুষটিই যদি দূরে রইলো সম্বোধনকে সমান টেনে লাভ কি। কাজ আর কাজ, কাজের বাইরে পড়লেই আপনি এমন স্তব্ধ হয়ে যান কারুর কোনো কথাই বুঝিবা আপনার কানে পৌঁছয় না। এই স্তব্ধতার আড়ালে কি কথা

লুকিয়ে আছে কে জানে! আপনার পরিচয়ও বিশেষ কিছু আমি জানিনে—জানতেও চাইনে। শুধু জানি আপনি মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, জীবনে সম্বল ব'লে গ্রহণ করেছেন যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যদি মনে ক'রে থাকেন আমি আপনার সেই আদর্শের পথে বাধা হবো—

জ্যোৎস্না

[রুদ্ধ আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে] না না, কোনো ভালো কাজের পথে আপনি বাধা হতে পারেন না সে আমি জানি—কিন্তু—কিন্তু হাত-পা আমার বাঁধা, এগুবার উপায় নেই—থাকলে—থাক্ সে কথা। শুধু এটুকু জেনে রাখুন আমিও কম কষ্ট পাচ্ছিনে নিজেকে এভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে—

রমেন

তবে আমাকে জানতে দাও জ্যোৎস্না কি সেই বাধা—এমন কি থাকতে পারে যা আমরা পার হয়ে যেতে পারবো না।

জ্যোৎস্না

না, তা হয় না—একদিন আপনাকে সব কথাই বলবো, এখন আমি যাই; কতগুলো পরিবার আমার পথ চেয়ে ব'সে আছে আপনি জানেন।

রমেন

এক দিন—একটা ঘণ্টা, তোমার কাজের চেয়ে আমার অনুরোধের মূল্যটা কি বেশি দিতে পার না জ্যোৎস্না? বোসো একটু—

জ্যোৎস্না

কাজ তো আমার একার নয়, এ কাজ আমার, আপনার, সকলের।

[এমন সময় ডাক-ঘণ্টিটা বার দুই বেজে উঠলো। কাপড়গুলো তুলে নিয়ে জ্যোৎস্না অন্তদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। রমেন উঠে সামনের দরজার কাছে যেতেই এগিয়ে এলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। হাতে একটা ব্রিফকেস, মুখে চোখে বিরক্তি মূর্ত হয়ে আছে—চোখের চাউনিতে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকত্বের আভাসও যেন পাওয়া যায়।]

রমেন

কি চাই আপনার?

ভদ্রলোক

[রুষ্টভাবে] কিছু না, কিছুই চাইনে, তোমার কাছে লোকে কি শুধু চাইতেই আসে যে প্রথমেই এ প্রশ্ন! অবাক কাণ্ড তো—

রমেন

অবাক কাণ্ড বৈ কি, এ চলতি প্রশ্নটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে। আমি জানতে চাচ্ছি কাকে আপনি চান, কি আপনার দরকার?

ভদ্রলোক

দরকারটা দরজায় দাঁড়িয়েই সারতে হবে নাকি? বসবার একটু জায়গা জুটবে না—দরকার কিছু আছে বৈকি, বিনি দরকারে অপরিচিত লোকের বাড়ি কেউ হানা দেয়! তুমিই রমেন তো?

রমেন

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক

ব্যস্, তোমাকেই চাই, এখন বোসো দেখি একটু ঠাণ্ডা হয়ে [নিজে বসলেন]—বাঃ, ঘরটিতো বেশ সাজানো-গুছোনো, দেখে খুশি হলুম।

রমেন

আপনার মুখ দেখে সে রকম মনে হচ্ছে না কিন্তু।

ভদ্রলোক

কেন আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি—খুশি হলেই তা মুখেচোখে ফুটিয়ে তুলতে হবে নাকি?—হ্যাঁ শোনো, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো কে এ লোকটা—আমার নাম মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তোমার বাবা ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁর মুখে আমার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই?

রমেন

আজ্ঞে হ্যাঁ শুনেছি।

মহেন্দ্র

শুনতেই হবে—কিছুদিন আগেও মস্ত লোক ছিলাম হে, মস্ত লোক ছিলাম। লাখ লাখ টাকার ব্যবসা ছিলো বর্মাতে, [ভাঙা গলায়] সব ফেলে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে এসেছি—তাও শুধু নিজের—যাক যাক সে সব কথা—এখন আমার পরিচয় এই 'একজন ভদ্রলোক, নাম মহেন্দ্র চ্যাটার্জি—'

[দীর্ঘশ্বাস ফেলে] আর সম্পদ বলতে একটি—[থামলেন]

রমেন

বলতে বাধা থাকলে না-ই বা বললেন।

মহেন্দ্র

না, বাধা কিসের, বলবো বলেই তো এসেছি। স্মরণ থাকতে ব'লে ফেলাই ভালো, কি বলো। কি কথায় কি কথা উঠে পড়বে, তখন হয়তো মনেই থাকবে না। মিলি তো আমায় বারবার সাবধান ক'রে দিয়েছে, কাজের কথাটা না ভুলি। [হতাশার সুরে] মিলিও আজকাল আমাকে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিয়ে, শাসন করে—অ, তুমি তো মিলি কে, তাই জান না, পরিচয় না দিয়েই নাম ক'রে যাচ্ছি। মিলি হলো আমার মেয়ে—পাকা একটি সোসাইটি লেডি, তার হাল-চাল কথাবার্তায় চোখ তোমার ঝলসে যাবে, এমনি সে মেয়ে। আমার ধনসম্পদ আর দম্ভের উৎকট ছায়া আজ কেবল ওকে অবলম্বন ক'রেই বেঁচে আছে। মিলিকে দেখিয়ে আজও আমি প্রমাণ করতে পারি কি আমি ছিলাম।

রমেন

আপনার শেষ সম্বলের কথা কি বলবেন বলছিলেন—যা আমাকে বলবেন বলেই নাকি এসেছেন।

মহেন্দ্র

ঠিক ঠিক স্মরণ করিয়ে ভালো করেছ, এই দেখ না এরই

মধ্যে আবার গুলিয়ে গিয়েছিলো। আমার শেষ সম্বল হলো তোমার বাবার দেওয়া একটি হ্যাণ্ডনোট। ত্রিশ হাজার টাকা তাকে ধার দিয়েছিলাম সে প্রায় দশ বছরের কথা। গত বছর মৃত্যুর আগে অবধিও সে তার সুদ যুগিয়ে গেছে।

রমেন

[বিবর্ণ মুখে] বাবার সব দেনাই আমি এই দেড় বছরের মধ্যে শোধ ক'রে দিয়েছি—অবিশ্যি সেগুলো এমন বড ব্যাপারও কিছু ছিল না—কিন্তু এত বড় একটা দেনা রয়েছে এ যে আমার ধারণার অতীত—বাবাও তো কখনো কিছু বলেন নি!

মহেন্দ্র

[উত্তেজিতভাবে] তোমার ধারণার অতীত বলেই এটা মিথ্যে হয়ে যাবে নাকি। প্রমাণ চাও তো এক্ষুণি দেখাচ্ছি [ব্যাগটা টেনে নিয়ে] এই ব্যাগের মধ্যেই আছে সেই সব কাগজপত্র।

রমেন

না না প্রমাণ আমি চাচ্ছি নে—আপনি মিছিমিছি একটা মিথ্যে বলতে এসেছেন এ আমি ভাববো কেন।

মহেন্দ্র

আমি মিথ্যে বলার লোক নই তুমি ঠিক ধরেছ রমেন। তুমি বড়ো ভালো ছেলে, দেখেই কেমন মায়া ব'সে গেছে। [একটু নরম সুরে] কথাটা শুনে বড়ই ভাবিত হয়ে পড়লে, না হে—সে তো হবারই কথা—তা দেখ টাকাটা আমি দাবি না করলেও পারি, সুদ থেকেই প্রায় আসল উঠে এসেছে।

রমেন

তা কেন হবে, আপনার পাওনা টাকা আপনি দাবি করবেন বই কি।

মহেন্দ্র

মিলিও ঠিক এই কথাই বলে, আমাদের পাওনা টাকা আমরা ছাড়বো কেন। মিলি আরও বলছিলো তুমি নাকি যুদ্ধের বাজারে ব্যবসায়ে অনেক টাকা রোজগার করছো, আমাদের পাওনা মেটাবার ক্ষমতাও নাকি আছে।

রমেন

না সে ক্ষমতা আমার নেই—কিন্তু আপনার মেয়ে আমার সম্পর্কে এত খবর জানলেন কি ক'রে?

মহেন্দ্র

তা আমি কি ক'রে বলবো। 'ইয়ঙ গারল' একজন 'ইয়ঙ্ ম্যান'-এর খবর রাখবে, তাতে অবাক হবার কি আছে! হয়তো তুমিও তাকে চেন, নাম জান না। ও তো বর্মায় থাকতো না, এখানে থেকেই পড়তো, এবার এম, এ পাশ করেছে—যাই বলো ইংরিজিটা কিন্তু আশ্চর্য রকম—

রমেন

শুনুন মহেন্দ্রবাবু, বাবার দেনা যখন রয়েছে, পরিশোধ আমি করবো কিন্তু সে জন্যে বেশ কিছু সময় আমাকে দিতে হবে। আমার যা আয় তা থেকে অত টাকা চার-পাঁচ বছরে পরিশোধ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মহেন্দ্র

না না সময়টময় দিতে আমি পারবো না। কেন, তোমার বাড়িটাই তো রয়েছে, এটা বিক্রি করলেই দেনা চুকিয়ে দিতে পার। অবিশ্যি আর একটা পথও আছে—তুমি ছেলে হিসেবে তো চমৎকার—মিলিকে যদি বিয়ে করো তো ঐ হ্যাণ্ডনোট তোমাকে আমি যৌতুক হিসেবেই দিয়ে দিতে পারি। [হঠাৎ মুখচোখ উজ্জ্বল ক'রে] এ একটা চমৎকার বুদ্ধি মাথায় এসে গেছে, কি বলো ?

রমেন

তা হয় না। সেটা আমার পক্ষেও সম্ভব নয় আর তিনিই বা রাজি হবেন কেন ?

মহেন্দ্র

রাজি হবে না ? কেন হবে না শুনি—যুক্তি দেখাক কেন হবে না—ঐ তো একটা ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, মিঃ ডে না কি, ছোকরাকে দেখলে আমার আপাদমস্তক জ্বলে যায় [হঠাৎ শাড়ি-কাপড়ে নজর পড়ায় একটু থেমে]— আরে একি, অত শাড়ি আর ধুতি এনে মজুত করেছ কেন ? অ—কাপড়ের ব্যবসাতে যুদ্ধের বাজারে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছ বুঝি— তা বেশ বেশ—

রমেন

আজ্ঞে না। এ হলো অর্জিত অর্থ প্রাণ খুলে খরচ করার একটা পথ মাত্র।



মহেন্দ্র

তার মানে?

রমেন

মানে তেমন কিছু নয় ছোটখাট একটি সমিতি গড়েছি দুঃস্থ সব ভদ্র পরিবারের সাহায্যকল্পে। ছেলেমেয়েরা গোপনে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা জেনে এসে গোপনে পৌঁছে দেয় কাপড় চা'ল যেখানে যেমন দরকার।

মহেন্দ্র

বাঃ বাঃ খুব ভালো কাজ করেছ—খুব ভালো [একটু থেমে] না—তেমন একটা ভালো কাজই বা বলি কি ক'রে। দুঃস্থ ভদ্রলোকদের একমাত্র ভাগ্য তারা তোমাদের শ্রেণীভুক্ত—ভদ্রলোকত্বের মান বাঁচাতে গিয়ে তাদের প্রাণ না হোক মান বাঁচানো তোমাদের দরকার। ছোটলোকরা সবাই ছোট তাই কেউ কাউকে ধ'রে রাখতে পারলো না। গোটা শ্রেণীটাই এসে গড়িয়ে পড়লো তোমাদের পথের ধুলোয়—অর্থাৎ দেশের ভিটে ছেড়ে শহরের ফুটপাথে। তাতে আরও ভালো হলো, লঙ্গরখানা খুলে বড়লোকের মাহাত্ম্য বাঁচলো, উদরাময়ে ওরাও উদ্ধার পেল চিরতরে—হাঃ হাঃ হাঃ—[একটু থেমে] ঠিক ঠিক ভালো কথা মনে পড়েছে। তুমি যখন এসব, জনসেবা-টেবার কাজে রয়েছ তুমি হয়তো বা খবরটা দিতে পারবে। শুনেছিলাম বর্মা থেকে পালিয়ে সে কলকাতাতেই এসেছিলো—সেও তো এসব কাজই ক'রে বেড়ায়, এখানে

থেকে থাকলে দেশের এ দুর্দিনে চুপ ক'রে ব'সে নেই নিশ্চয়ই।

রমেন

লোকটি কে, কি নাম তার?

মহেন্দ্র

নাম, নাম তার মাধুরী, চেন মাধুরী নামে কোনো মেয়েকে? ছিপছিপে একহারা শরীর, সুন্দর মুখে উজ্জ্বল দুটি চোখ—ধীর, স্থির, শান্ত। তাকে আমার বড়ো প্রয়োজন।

রমেন

মাধুরী নামে কোনো মেয়েকে আমি চিনিনে। কিন্তু বলতে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি, আপনার সঙ্গে কি তার সম্পর্ক, কেনই বা সে পালিয়ে এসেছিলো?

মহেন্দ্র

বলা কি আমার উচিত হবে—তা তোমার কাছে বলা যেতে পারে, তোমাকে বিশ্বাস করতে কেমন যেন মনে কোথাও আটকাচ্ছে না। কিন্তু কথা দিতে হবে, মিলিকে ঘুণাক্ষরে জানতে দেবে না আমি মাধুরীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুনলে সে আর রক্ষে রাখবে না।

রমেন

মিলিদেবীকে আমি যে চিনিই না।

মহেন্দ্র।

চিনতে কতক্ষণ—আমাদের তো এক সঙ্গেই এখানে আসবার

কথা ছিলো, আমি চুপচাপ আগে বেরিয়ে পড়েছি ব'লে। কে জানে এরই মধ্যে হয়তো এসে হাজির হবে। ওর ধারণা টাকার তাগিদটা তেমন জোরালো ক'রে আমি দিতে পারবো না।

রমেন

ধারণা তাঁর সত্যি, সে আপনি পারেনও নি। সে কথা যাক, মাধুরী সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমি তাঁকে কিছু বলবো না।

মহেন্দ্র

বেশ, শোন তবে তার পরিচয়। মাধুরী আমার পুত্রবধূ।

রমেন

[বিস্মিত হয়ে] আপনার পুত্রবধূ—তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলেন কেন?

মহেন্দ্র

না পালিয়ে তার উপায় ছিলো না, আমরা পিতা-পুত্রে তার প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলছিলাম।

রমেন

তার অপরাধ?

মহেন্দ্র

অপরাধ সে আমাদেরই তুচ্ছ এক কর্মচারীর মেয়ে। তুমি জিজ্ঞেস করবে এত বড় মালিকের ঘরের বৌ সে হলো কেমন ক'রে। অনিবার্য কারণে—তখন মাধুরীর বয়স বিশ

কি একুশ হবে, ওখানকার শ্রমিক সঙ্ঘের ছিলো সে একজন মেম্বর। একদিন চাঁদা চাইতে এলো আমার ছেলে বিমলের কাছে। মেয়েদের সম্পর্কে বিমলের চরিত্র ছিলো খুবই দুর্বল —ফুটফুটে চেহারা দেখেই চাঁদার হার তার বেড়ে গেল—শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের ভরসটাও হয়তো সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতো যাতে আবার তাকে আসতে হয়। হাজার-দু'হাজার টাকা চাঁদাও সে দিয়েছে। সঙ্ঘের প্রয়োজনেই মাধুরী আসতো, নয়তো টাকার জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার মতো মেয়ে সে নয়, তার পরিচয় আমি পেয়েছি। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো, বিমল বিয়ে না করলে মাধুরীর জাত বাঁচে না—অবিশ্যি বিমলের জাত মারতে পারে এমন ক্ষমতা কোনো কিছুরই ছিলো না, কারণ সে হলো লক্ষপতি। কিন্তু মাধুরীর সঙ্ঘের শাসানিতে ভয় পেয়েই বিমল তাকে গ্রহণ করলো—মাধুরী অব্রাহ্মণ অতএব বিয়ে হলো তিন আইনে—সমাজে আমাদের মাথা কাটা গেল, সকলেই বললো মেয়েটার উদ্দেশ্যই ছিলো এই। তারই প্রতিবাদে মাধুরী আমাদের বাড়ির কোনো বিলাসকে কখনো পা দিয়েও স্পর্শ করে নি। তারপর হলো তার সেই সন্তান—সে সন্তানও বাঁচলো না—বা বিমল তাকে বাঁচতে দিলো না—বেশ তো বলছিলাম, হঠাৎ কেমন যেন সব গুলিয়ে যেতে চাচ্ছে, রোসো একটু স্থির হয়ে নিই।

রমেন

এখন তাঁকে আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন?

মহেন্দ্র

খুঁজে বেড়াচ্ছি ক্ষমা চাইবো ব'লে। যেদিন জানলাম আমারই কারখানায় ধর্মঘট চলছে আমারই টাকায় আর সে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে মাধুরীর হাত দিয়ে, সেদিন কি অত্যাচারটাই তার দেহের ওপর দিয়ে গেছে সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। মজুরদের আশীর্বাদ তার সকল শরীরে চাবুক হয়ে ছিটকে পড়েছিলো বিমলের হাত দিয়ে। কপালের বাঁ পাশটা কেটে ঝরঝর ক'রে রক্ত গড়াচ্ছে—আজও চোখে ভাসে। কে জানে হয়তো এখনও আমাদের সেই কলঙ্কের দাগ তার কপালে রয়েছে।

রমেন

[চিন্তিত ভাবে] কপালের বাঁ দিকে দাগ—আচ্ছা মাধুরী ছাড়া তার কি অন্য কোনো নাম আছে ?

মহেন্দ্র

থাকতে পারে, আমি জানিনে—কেন ওরকম দাগওয়ালা কোনো মেয়ে তোমার চোখে পড়েছে, চেন তুমি তাকে—

[এমন সময় দরজার ডাক-ঘন্টিটা আবার বেজে উঠলো]

মহেন্দ্র

[চম্‌কে] দেখতো মিলি এল নাকি ?

[রমেন উঠে গেল। তার সঙ্গে এসে ঢুকলো মিলি]

মিলি

বাবা এ তোমার ভারি অন্যায়, আমাকে ফেলে চ'লে এলে কেন ?

মহেন্দ্র

[চ'টে উঠে] এসেছি বেশ করেছি, সে জন্যে তোর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ?

রমেন

আপনি চটছেন কেন ?

মহেন্দ্র

[আরো চ'টে উঠে] আরে ধ্যাত্তরি চটলাম কোথায়—

রমেন

[হেসে] না না আপনি চটেন নি, আমারই বুঝতে ভুল হয়েছে, এখন বসুন তো এখানটায় স্থির হয়ে—বসুন মিলিদেবী।

মহেন্দ্র

তুমি ঠিকই বলেছ রমেন, আমি একটু চটেই উঠেছিলাম। কি জান 'ইট ইজ ব্যাড লিভর', যকৃতের ব্যাপার। মিলি ভাবে স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ সব হারিয়ে আমার মেজাজটাই বিগড়ে গেছে। এমন কি মাথায়ও সামান্য দোষ ঘটেছে ব'লে সন্দেহ করে—কিন্তু আমি জানি তা নয়, আমি সব সইতে পারি, অপরিসীম আমার সহ্যগুণ—'ইট ইজ অল ডিউ টু ব্যাড লিভর'। [উৎসাহের সুরে] তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখো রমেন রুগ্ন হৃদযন্ত্র করে গম্ভীর, ফুসফুসে রোগ ঢুকলে হয় লোক স্ফূর্তিবাজ আর যকৃত বিগড়োলে বিগড়োয় মেজাজ—খিটখিটে তোমায় হতেই হবে।

মিলি

'অল রট'—আচ্ছা বাবা ব'সে ব'সে এতক্ষণ এসব বাজেই বকলে না কাজের কথাটাও বলেছ ?

মহেন্দ্র

[ক্রুদ্ধস্বরে] ছুটে এসেছ যখন নিজেই বলো না, আমার বলায় কি তোমার বিশ্বাস আছে ? টাকা টাকা ক'রে ক্ষেপে উঠেছে, কিছু টাকা হাতে না পড়লে মিঃ ডি-কে নিয়ে নেচে বেড়ানোর সুবিধে হচ্ছে না বুঝি—তুমি এখানে ব'সে টাকা আদায়ের পথ দেখ আমি চল্লাম—যত সব—

[ব্যাগ ফেলেই ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন]

মিলি

'হোয়াট এ পিটি, স্যানিটি' ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—

রমেন

হ্যাঁ, সুস্থ মস্তিষ্কে সত্য কথাগুলো এত স্পষ্ট ক'রে বলা সম্ভব নয়, মাথার দোষ একটু ঘটেছে ব'লেই মনে হয়।

মিলি

এতক্ষণ এখানে ব'সে উনি বাছা বাছা সব সত্য বলছিলেন বুঝি ? আর আপনি তা 'এনজয়' করছিলেন, না—

রমেন

'এনজয়' করিনি, সশ্রদ্ধভাবে শুনেছি।

[সুধীরের প্রবেশ]

সুধীর

জ্যোৎস্নাদি আরও কিছু কাপড় আর চাল নিতে পাঠালেন।

রমেন

নিয়ে নাও ওখান থেকে।

সুধীর

একটা সুখবর দিচ্ছি রমেনদা, জ্যোৎস্নাদি আজ বেরিয়েই পাঁচশো টাকা চাঁদা আদায় করেছেন এক মাড়োয়ারীর কাছ থেকে—দু'গাঁট কাপড় দেবে বলেও সে কথা দিয়েছে।

রমেন

তাই নাকি, খুবই আনন্দের কথা। [ধীরে চিন্তিত ভাবে] আচ্ছা সুধীর, তোমার জ্যোৎস্নাদির কপালের বাম পাশে আবছা একটা কালো দাগ আছে না—তোমার নজরে পড়েছে কখনো?

সুধীর

অত লক্ষ্য করে তো দেখিনি, আছে বলেই যেন মনে হচ্ছে—কেন বলুন তো?

রমেন

না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম—হঠাৎ কেমন মনে হলো দাগ একটা দেখেছি—আবার স্পষ্ট মনেও পড়ছে না। মনে করতে গিয়ে না পারলে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয় না—তাই—আচ্ছা তুমি কাপড়গুলো গুণতি ক'রে নাও, যাবার সময় ব'লে যেও কোনটা কখানা নিলে।

সুধীর

আচ্ছা। [সুধীর কাপড়ের স্তূপের কাছে এগিয়ে যায়]

মিলি

অ-হ্—আপনারও 'সোস্যাল সারভিস' করার রোগ আছে দেখছি—এর কথা শুনে মনে হলো মেয়ে 'ওয়ারকারস্'-ও আছে আপনাদের মধ্যে।

রমেন

তা আছে। একজন দু'জন নয়, বেশ কিছু।

মিলি

[ভ্যানিটি কেস থেকে পাউডার-পাফ্টা নিয়ে মুখে লাগাতে লাগাতে] তা থাকবে না, এ যে মেয়েদের মধ্যে একটা ফ্যাশান হয়েছে—'সোস্যাল সারভিস' করা, 'কম্যুনিস্ট' হওয়া—চাঁদা তোলার নাম ক'রে বড় বড লোকের বাড়ি হানা দেবে, আর বড়ো বড়ো ধরতাই বুলি আওড়াবে—আসলে সবই হলো ছেলে পাকড়াও করার ফন্দি।

রমেন

ছেলে পাকড়াও করাই যদি উদ্দেশ্য হবে, তবে আপনাদের এই জোরালো ফন্দি ফেলে 'কম্যুনিস্ট' হতে যাবে কেন? সাধারণ একখানা শাড়ি আর রোদে পোড়া চামড়ার চেয়ে, আপনাদের এই ঝকমকে শাড়ি আর টক্‌টকে ঠোঁটের টানটাই তো যৌবনের পক্ষে জোরালো—এ তথ্যটা, আপনি যাদের কথা বলছেন, সেই সমাজসেবী মেয়েরাও জানে নিশ্চয়ই।

মিলি

ওঃ এদিক দিয়ে ওসব মেয়েরা ভারি সেয়ানা। ওরা ঠিক টের পেয়েছে, আজকালকার অধিকাংশ ছেলেই 'ইডিওলজি'র ভক্ত।

রমেন

আপনার কথায় মনে হচ্ছে, দেশের ছেলেরা রীতিমতো মানুষ হয়ে উঠেছে, তাই আপনারা আর পেরে উঠছেন না।

মিলি

মানুষ হয়েছে না ছাই! আপনিও তো ওদেরই দলের— 'বার্ডস অব সেম ফেদার'—তাই সুযোগ পেয়ে খুব একটা খোঁচা দিয়ে নিলেন। যাই বলুন, ওসব ভড়ং আমি সইতে পারিনে। বেশ তো, মজদুরদের সঙ্গে জুটেছিস, সেই রকমই থাক— ছোটবার সময় ছুটছে দেখবেন বড়লোকের পেছনে।

রমেন

ভালোই তো। বড়লোকদের যে টাকাটা খরচা হতো শাড়ি-গয়না,- সিনেমা আর কস্‌মেটিকস্‌-এর পেছনে, সেটা তার চেয়ে বড়ো কাজে ব্যয় করার উৎসাহ যোগাতে পারবে।

মিলি

'ওয়েল মিস্টার সেন, ইউ হ্যাভ ফল্‌স রিগার্ডস্‌ ফর ইওর কমরেডস্‌'। বিয়ের পর ভোল বদলে যায়। আমি দেখুন এসব ব্যাপারে ভারি 'ক্যানডিড্‌', বাবাকে খোলাখুলি ব'লে দিয়েছি, ছেলের রূপ-গুণ যেমনই থাক, টাকাটি থাকা চাই-ই।

তিন মাইল ট্রামে চ'ড়ে, তৃতীয় শ্রেণীতে সিনেমা দেখে আসবো, সে আমাকে দিয়ে হবে না।

রমেন

হয় না বলেই তো যত না আপনারা পরীক্ষা পাশ করুন, যত না পথে বিপথে একা একা ঘুরে বেড়ান, আর যতই না পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দাবি করুন, আমরা আপনাদের বিলাসের সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই ভাবতে পারিনে। তাই আপনাদের মতো মেয়েদের জন্যে আমরা ভিড় ঠেলে পথ ক'রে দিই, ট্রামে-বাসে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াই, সুযোগ পেলেই অর্থ খরচ ক'রে আমোদের ব্যবস্থা করি। কিন্তু আপনার কথিত ঐ কম্যুনিস্ট মেয়েদের ধাতে এ সম্মান সয় না, পুরুষের এ-বিলাস সসম্মানে তারা প্রত্যাখ্যান করে। বন্ধুত্বের বেলায়ও পুরুষের কাঁধে ভর করবে বলেই তারা এগিয়ে আসে না, তাই তার আর্থিক অবস্থা নিয়েও সুরুতেই ভাবিত হয়ে পড়তে হয় না—অবশ্য অর্থ থাকে ভালো—

মিলি

খুব তো লম্বা একটা বক্তৃতা দিলেন ওসব মেয়ের পক্ষ নিয়ে, ভাববেন না ও জাতের মেয়েদের আমি চিনি নে। আপনাদের এই শ্রমিক ঘেঁষা মেয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের পরিবারের যথেষ্ট আছে। ওঃ পরিবারটার সর্বনাশ করতে উঠে প'ড়ে লেগেছিলো—আজও ওর কথা মনে হলে ঘেন্নায় আমার গা কেমন ক'রে ওঠে। টেরটা আপনিও পাবেন—এই

তো শুনলাম জ্যোৎস্না না কে যিনি মোটা চাঁদা আদায় করেছেন, যাঁর কপালের কালো দাগ আপনার চোখে ভাসছে—দেখুন, জোটবার সময় এসে জুটেছে আপনার মতো লোকের সঙ্গে, যার হাতে কাঁচা পয়সা আছে—ঘায়েলও ক'রে এনেছ, কপালের কালো দাগ নিয়েই যখন অত ভাবনা—

সুধীর

[পেছন থেকে এগিয়ে এসে ক্রুদ্ধ স্বরে] কে এই মহিলাটি রমেনদা, এখানে ব'সে এসব যা তা কথা বলছেন—

রমেন

যাও সুধীর তুমি তোমার কাজ করগে যাও, এসব কথায় তোমার কান দেবার দরকার নেই। [একটু থেমে] কপালের দাগের কথাটা যখন জিজ্ঞাসা করি তখন খেয়াল ছিলো না ইনি উপস্থিত, আবার এতক্ষণ ধ'রে কথা বলবার সময় মনেই ছিলনা তুমি পেছনে ব'সে কাপড় গুণছো—আজ আমার মাথাটাই যেন কেমন হয়ে গেছে—

[সুধীর সরে গেল]

মিলি

আপনার এই কমরেডদের অন্য শিক্ষার সঙ্গে ভদ্রতাটাও একটু শেখাবেন—একেবারে 'এটিকেট' জ্ঞান নেই। আমরা কথা বলছি তাতে ওর 'ইন্‌টারফিয়র' করতে আসা উচিত নয়।

রমেন

অন্যায়ের মাত্রাটা অতিরিক্ত হয়ে পডলে ভদ্রতার মুখ চেয়ে চুপ ক'রে থাকতে সকলে পারে না মিলিদেবী।

মিলি

অ—ওর ব্যবহারটা আপনি সমর্থন করছেন। অন্যায়টা হলো বুঝি আমার, 'স্ট্রেনজ'! আলোচনা উঠে পড়লো, আপনিও বলছেন আমিও বলছি, আপনিও আমাকে 'পিন্‌চ' করতে কম করেননি—একজন মহিলাকে বাড়ি পেয়ে অপমান করায় কোনো পৌরুষ নেই জানবেন—'লেট আস কাম টু বিজনেস', কাজের কথা বলতে এসেছি সেটাই বলা যাক, এসব বাজে কথার দরকার কি।

রমেন

এটুকু আর কিছুক্ষণ আগে বুঝলেই ভাল হতো—হ্যাঁ, বলুন কি আপনি বলতে চান।

মিলি

আমাদের টাকাটার কি করছেন বলুন—বডজোর একমাস সময় আপনাকে দিতে পারি।

[ব্যস্ত ভাবে জ্যোৎস্নার প্রবেশ]

জ্যোৎস্না

[মিলিকে লক্ষ্য না ক'রে] আচ্ছা সুধীর, কি করছো তুমি এখানে ব'সে—এখনো হলো না তোমার ?

সুধীর

এই হয়ে গেছে জ্যোৎস্নাদি—এঁদের কথায় কান দিতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।

মিলি

[অবাক চোখে তাকিয়ে] একি—বৌদি!

জ্যোৎস্না

[ঘুরে দাঁড়িয়ে] কে—মিলি—তুমি, তুমি এখানে—

মিলি

[বিস্ময় কেটে গিয়ে মুখে দেখা দিলো ব্যঙ্গের ভাব] ও—তুমিই জ্যোৎস্না—বাঃ বেশ নাম ভাঁড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছতো। পোষাক দেখে মনে হয় না দাদার মৃত্যুর খবরটা পেয়েছো।

জ্যোৎস্না

[কঠোর কণ্ঠে] পাইনি—পেলেও পোষাক আমার বদলাতো না।

মিলি

'ইনহিউম্যান, সিম্পলি হার্টলেস'! খবরটা শুনে সামান্য একটু দুঃখ পেলে ব'লেও মনে হচ্ছে না।

জ্যোৎস্না

কিন্তু দুঃখ আমি পেয়েছি, কাজটা নিজের হাতে করতে পারিনি ব'লে—পশু হত্যায় পাপ নেই।

মিলি

ওঃ—'হোয়াট এ ভাইল উয়োম্যান'!

সুধীর

আপনি স্ত্রীলোক নইলে একটি একটি ক'রে হাড় আপনার ভেঙে দিতুম।

জ্যোৎস্না

চুপ করো সুধীর, তুমি যাও তো এখান থেকে—যাও ভাই বলছি।

সুধীর

যাচ্ছি।

মিলি

ওকে ভাগিয়ে দিলে কেন, পেছনে লেলিয়ে দিলেই তো পারতে? গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়াই তো তোমার কাজ—দাদার পেছনেও শুনেছি গুণ্ডা লাগিয়েছিলে।

জ্যোৎস্না

রমেনবাবু, এর সঙ্গে কি আপনার সম্পর্ক, কেন এখানে এসেছে, আমি জানি না, কিন্তু এটা আপনাকে জানাচ্ছি, এ থাকলে আর মুহূর্তও এখানে দাঁড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়—আমি যাচ্ছি—

রমেন

তুমি—তুমি যাবে কেন জ্যোৎস্না [হাত ধরলো]

জ্যোৎস্না

[আদেশের সুরে] তবে তোমাকেই যেতে হবে মিলি—যাও বলছি—

মিলি

[কৌচ থেকে ফিনিক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে] যাবই তো, তোমার মতো থাকতে আমি আসি নি এখানে—বাঃ রমেনবাবু, অতিথির অপমানটা দাঁড়িয়ে বেশ উপভোগ করছেন তো—

জ্যোৎস্না

এর পরও এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছো! তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে বাধ্য কোরো না আমাকে।

মিলি

যার বাড়ি নিয়ে অত বড়াই করছো, তোমার সেই 'প্যারামার'টিকে আমি ভিটে ছাড়া করতে পারি, এটা হয়তো তুমি জান না [যেতে যেতে] আর করবোও তাই—এই ব'লে গেলাম। [দমক্ মেরে বেরিয়ে গেল]

রমেন

তোমার সকল শরীর কাঁপছে জ্যোৎস্না—এস, এই সোফাটায় ব'সে একটু স্থির হতে চেষ্টা করো।

জ্যোৎস্না

[ক্লান্তভাবে সোফায় এলিয়ে প'ড়ে চাপা ভাঙা গলায়] যাক্, ভালোই হলো—তোমাকে কোনো কথাই খুলে বলতে পারছিলাম না, সে বাঁধ আপনা থেকেই ভাঙলো। আজ—আজ সবই বলবো,—তারপর—

রমেন

কিছুই তোমাকে বলতে হবে না জ্যোৎস্না, সবই আমি

শুনেছি, তবে কিনা তোমার কাহিনী মনে ক'রে শুনিনি, শুনেছি মাধুরী নামে একটি মেয়ের দুঃখের আর ধৈর্যের ইতিহাস।

জ্যোৎস্না

[বিস্ময় মেশানো ভাঙা গলায়] সে-নামের ইতিহাস তুমি শুনেছ—কার—কার কাছ থেকে শুনলে ?

রমেন

মহেন্দ্রবাবুর মুখে।

জ্যোৎস্না

[ঘৃণায় মুখ বিকৃত ক'রে] সেও এখানে এসেছিলো ! এরা কেনই বা এখানে এসেছে—মিলি যাবার সময়ই বা কি সব ব'লে গেল, কিছুই বুঝলাম না।

রমেন

তুমি কি ক'রে বুঝবে জ্যোৎস্না, এ ঘটনার আগে অবধি আমিই যে কিছু জানতাম না। মহেন্দ্রবাবু ছিলেন বাবার বন্ধু, বাবা তাঁর কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন, ওঁরা এসেছিলেন তারই তাগিদ দিতে। শোধ দেওয়া সম্পর্কে কিছুটা সুবিধা হয় তো বা পাওয়া যেত, এর পরে আর সে-আশা করা বৃথা—

জ্যোৎস্না

কিন্তু—কিন্তু অত টাকা তুমি এখন পাবে কোথায় ? তোমাকে যে পথে দাঁড়াতে হবে।

রমেন

[আবেগ মিশ্রিত চাপা গলায়] সে-পথে তুমি আমার পাশে থাকবে তো জ্যোৎস্না ?

জ্যোৎস্না

[আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে] আমি—আমি থাকবো বই কি—আমি তো পথেরই মানুষ, পথে আমার ভয় কিসের ?

[ব্যস্ত-সমস্তভাবে মহেন্দ্রবাবুর প্রবেশ]

মহেন্দ্র

এই দেখ কি কাণ্ড করেছি, ব্রিফকেসটাই ফেলে গেছি এখানে। [ব্যাগটার দিকে এগিয়ে গেলেন] ওরই মধ্যে রয়েছে সব দলিলপত্র। এমন ভুলো-মনই হয়েছে—বলো কেন—[ব্যাগ খুলে কাগজপত্র দেখে নিয়ে] এই তো সব ঠিকই আছে—তোমার বাবার হ্যাণ্ডনোটটি পর্যন্ত যথাস্থানে। তুমি ভালো লোক ব'লে তাই না—যাদের দেওয়া হ্যাণ্ডনোট তাদের বাড়িই ফেলে গেছি—তেমন দুষ্ট লোক হলে কি সর্বনাশটাই হতো বলো দেখি—[হঠাৎ জ্যোৎস্নার দিকে চোখ পড়ায়] একি—একি দেখছি—বৌমা—মাধুরী—তুমি—আমি তোমাকেই যে খুঁজে বেড়াচ্ছি—

জ্যোৎস্না

[কঠোরস্বরে] কেন, আমাকে দিয়ে আপনার কি প্রয়োজন —একটা অসহায় মেয়ের ওপর অত্যাচার করার সাধ কি আজও আপনাদের মেটে নি ?

মহেন্দ্র

তোমার মুখে-চোখে ঘৃণা ফুটে উঠেছে বৌমা—ওটাই স্বাভাবিক—এই তো আমার পাওনা—কিন্তু আজ তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি প্রাণ খুলে একটিবার ক্ষমা চাইবো ব'লে—

জ্যোৎস্না

[বিস্ময়ের সুরে] ক্ষমা—আমার কাছে আপনি ক্ষমা চাইবেন—

মহেন্দ্র

অবাক হবারই কথা—একদিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও যে-কথাটা বুঝিয়ে আসতে পার নি, সর্বস্ব খুইয়ে সে-সত্য আমি জেনে এসেছি। যেদিন সব সম্পদ ছেড়ে পথের ধুলোয় নেবে দাঁড়াতে হলো দশজন সাধারণের মাঝখানে, সেদিন জানলাম কতখানি মেকি মূল্যে নিজেকে ফাঁপিয়ে রেখেছিলাম—কি যেন, জীবনকে ঢেলে সাজতে হলে এমনি একটা বিপর্যয়ই হয়তোবা দরকার। কি এক আবর্তের সামান্য ছোঁয়া লেগে কোথা থেকে কোথায় ছিটকে এসে পড়লাম, উঠে দেখি আগেকার বিচারবুদ্ধিও সব গেছে উলটে পালটে—যাক, যাক সে-সব কথা—আজ তোমার ওপর আমার শেষ অত্যাচার, আমাকে তোমায় ক্ষমা করতে হবে।

[জ্যোৎস্না এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলো]

মহেন্দ্র

[বিস্মিত হয়ে] তুমি আমাকে প্রণাম করছো বৌমা—তাহলে তুমি আমাকে সত্যি ক্ষমা করতে পেরেছ! আজ

আর আমার কোনো ক্ষোভ রইলো না—তবে এখন তুমি তোমার ঘরে ফিরে চলো বৌমা, আর রাগ ক'রে দূরে স'রে থেকো না—

জ্যোৎস্না

এটাই যে আমার ঘর বাবা।

মহেন্দ্র

[অবাক চোখে তাকিয়ে] এটাই তোমার ঘর!

রমেন

হ্যাঁ, এটাই ওর ঘর—আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।

মহেন্দ্র

আশীর্বাদ করবো—আশীর্বাদ করবো আমি—তাইতো—[হঠাৎ যেন স্থির ক'রে] হ্যাঁ করবো বই কি, আশীর্বাদ, করবো বই কি [ক্ষীণকণ্ঠে] তোমরা সুখী হও—সার্থক হও—

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী পদক্ষেপে ধীরে-ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। জ্যোৎস্না আর রমেন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো তাঁর নিষ্ক্রমণ লক্ষ্য ক'রে—মহেন্দ্রনাথ হঠাৎ আবার ফিরে দাঁড়ালেন।

এই দেখ, শুধু হাতে আশীর্বাদ ক'রে ফিরে যাচ্ছি—আমি—আমি হলাম মহেন্দ্র চ্যাটার্জি, আমি শুধু হাতে আশীর্বাদ করবো [ব্যাগ খুলে] এই—এই সেই হ্যাণ্ডনোট [ছিঁড়ে টুকরো করতে করতে] বস্—বস্—বস্—যাক চুকলো ল্যাঠা—জান মা, আজকাল মাথাটা আমার মাঝে মাঝে কেমন যেন বিগড়ে যায়—যাক সুস্থ মুহূর্তে কাজটা সেরে গেলুম—[একটু অপ্রকৃতিস্থভাবে চাপা গলায়] তোমরা দু'জনে অমন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে—না, না—বুঝি যাই—আমি যাই—]